বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপন্যাসে অরণ্য ও আরণ্যক জীবন

বাংলা উপন্যাসে অরণ্যকে তার সমগ্র ব্যাপ্তি, গভীরতা ও সপ্রাণ অস্তিত্বে ধরে রেখেছেন অরণ্য-উপাসক ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু অরণ্যের জন্যই এত গভীরভাবে ভাবা - বাংলা উপন্যাস তো বটেই বিশ্বসাহিত্যেও বিরল। কর্মসূত্রে বিভূতিভূষণ অরণ্যের নৈকট্যে আসেন এবং এই অরণ্যসান্নিধ্য তাঁর মনোজগতে এক অসাধারণ রূপান্তর আনে। তিনি ওতপ্রোতভাবে অরণ্যের অখন্ডতায় জড়িয়ে পড়েন। এই অরণ্যপ্রেম সঞ্চারিত ও সঞ্চালিত হয় তাঁর আগামী জীবনযাপনে এবং সৃষ্টিতে। বিভূতিভূষণ-এর কর্মজীবন ছিল বহুধাবিস্তৃত, বৈচিত্র্যময়। যা তাঁর সৃষ্টিকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। ১৯২৩ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তিনি পাথুরিয়াঘাটার খেলাৎচন্দ্র ঘোষ-এর জমিদারির কর্মী হিসেবে নানান পদে নিযুক্ত থেকেছেন। কখনো তাঁর পুত্র সিদ্ধেশ্বর ঘোষ-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী, কখনো সিদ্ধেশ্বরবাবুর ভাগ্নে বিভূতিভূষণ বসু-র গৃহশিক্ষক, কখনো তাঁদের ভাগলপুর এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, কখনো আবার ধর্মতলা স্ট্রীট খেলাৎচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশন-এর শিক্ষক। ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে বিভূতিভূষণ ভাগলপুরে খেলাৎচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়ে আসেন। ভাগলপুর শহরে 'বড়বাসা' নামে একটি বাড়ীতে তিনি থাকতেন এবং সেখান থেকে প্রায়ই তাঁকে ইসমাইলপুরের জঙ্গলমহাল দেখতে যেতে হত। ভাগলপুর পর্ব বিভূতিভূষণ-এর সাহিত্য জীবনের এক স্মরনীয় অধ্যায়। এই জঙ্গলমহালে তাঁকে দিনের পর দিন থাকতেও হয়েছে। 'বড়বাসার নির্জনতা এবং অরণ্যের নিঃসঙ্গতা তাঁকে মুগ্ধ করতে শুরু করেছে।'[১]

' নির্জন বিকেলে, জ্যোৎস্নারাতে তাঁর দূর অতীতের কথা মনে পড়তো। সে সব মুহূর্তে মনে হত হাজার বছর আগের সব শিশুর মিষ্টি হাসি নদীর ধারে, বনে মাঠে ফুল হয়ে ফুটে আছে। আর তাই নিয়েই আনন্দের যোগ্যশালার দরজা খোলা। সেই সঙ্গে অনুভব করতেন, সাহিত্যের মাধ্যমেই এই আনন্দের বার্তা সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।'[২] এই মহৎ নান্দনিক মন নিয়ে বিভূতিভূষণ অরণ্য ও আরণ্যক চেতনাকে উপলব্ধি করতে চাইলেন। এখানে সাধারণ নাগরিক-বোধের থেকে তাঁর অনুভব অনেকটাই আলাদা এবং অবশ্যই উচ্চমার্গের। সাধারণ মানুষ অরণ্যে একাকিত্বের কর্মজীবনকে চিরকাল নির্বাসিনতুল্য মনে করে এসেছেন। সেই আরণ্যক নির্বাসিনকে বেশীর ভাগ মানুষ দীর্ঘদিন সইতে পারেন না। অরণ্য-জীবন তাদের কাছে

সুখকর হয় না। উল্টোদিকে অরণ্য বিভূতিভূষণকে অনাস্বাদিত আনন্দের চরমে নিয়ে গেল। তাঁর সৃজনসত্তাকে ভাবনার অবকাশ দিল। এই নির্জনতায় তিনি নানান নতুন প্লট নিয়ে মনে-মনে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। অরণ্য তাঁর সৃজনশীল সত্তাকে আরেকভাবেও প্রভাবিত করলো। ভাগলপুর ও জঙ্গলমহালের অখন্ড একাকিত্বে তিনি ভীষণ নস্টালজিক হয়ে উঠতেন কখনো-কখনো। পেছনের দিনগুলোর কথা তীব্রভাবে মনে পড়তো। যে প্রিয়জনেরা বহুদূরে রয়েছেন তাঁদের জন্য বিপুল বেদনা বোধ করতেন। ' তখন এক গভীরতর তাৎপর্যে দুঃখ তাঁর কাছে অমূল্য সম্পদ হয়ে দেখা দিত।' তাঁর মনে হত 'sadness' ভিন্ন জীবনে profundity আসে না। emotional sadness জীবনের একটা খুব বড় সম্পদ।'[৫] এই দুঃখবোধ, নস্টালজিক অনুভূতি এবং গভীর অরণ্যাবসর 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' লেখার পেছনের মাটি তৈরী করে দিয়েছিল। কিন্তু শুধুমাত্র অরণ্য নিয়েই একটা স্বয়ম্ভু উপন্যাস লেখার তাগিদ তাঁর মধ্যে নিবিড়ভাবে কাজ করছিল। আমরা জানি বিভূতিভূষণের দিনলিপি লেখার অভ্যেস ছিল। ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত লেখা তাঁর অসংখ্য দিনলিপি প্রমাণ করে এই অরণ্য-উপন্যাসের প্রস্তুতির কথা। তার পটভূমি, ভৌগলিক পরিচিতি, মানুষজন ইত্যাদি দিনলিপির পাতায় বিভূতিভূষণ ধরে রাখছিলেন। তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি - ''এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো - একটা কঠিন শৌর্য্যপূর্ণ গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি। এই বন নির্জনতা ঘোড়ায়-চড়া, পথ-হারানো - অন্ধকার - এই নির্জনে জঙ্গলের মধ্যে খুবড়ী বেঁধে থাকা। মাঝে মাঝে যেমন আজ গভীর বনের নির্জনতা ভেদ করে যে সুঁড়ি-পথটা ভিটেটোলার বাথানের দিকে চলে গিয়েছে দেখা গেল, ঐরকম সুঁড়ি-পথ এই বাথান থেকে আর এক বাথানে যাচ্ছে - পথ-হারানো , রাত্রের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া করে ঘোরা, এ দেশের লোকের দারিদ্র, সরলতা, এই virile, active life, এই সন্ধ্যায় অন্ধকারে ভরা গভীর বন ঝাউবনের ছবি - এই সব।''[৬] কিংবা ''A novel on forest'। ওতে নির্জনতার কথা থাকবে, গাছপালার কথা থাকবে। অরণ্যানী - খাঁড়া উঁচু পাথরের স্তর। ধাতুপ্রস্তর। রঙিন ঝরনা যা অরণ্যের মধ্য দিয়ে নেমে আসচে। পাহাড়ের মাথায় রাঙা রোদ। শিউলিবন - দাবানল টাঁড়বারো অনেকে দেখেচে - গভীর রাত্রের অন্ধকারে খাদানের কাছে দাঁড়িয়ে মহিষের পালকে রক্ষা করবে।''[৭] কিংবা ''Forest-এর নভেলে জমিদার অর্থবান ও Rich, প্রজা দুঃস্থ ও গরীব - উভয়ের দ্বন্দ্ব, এইটি ফোটাব। ওরা হোমলেস।... ওরা খেতে পায় না। নন্দরাম গোঁসাই ইত্যাদি ... my strength.''[৮] এই সমস্ত দিনলিপি প্রমাণ করে বিভূতিভূষণ একটা অনন্য

অরণ্য-উপন্যাসের জন্য তিলে তিলে নিজেকে গড়ছেন। বাংলাভাষায় তাঁর সামনে শুধুমাত্র অরণ্য নিয়ে কোনো উপন্যাসের অস্তিত্ব ছিল না। অরণ্য এর আগে পটভূমি হিসেবে এসেছে। কিন্তু তিনি চাইছিলেন অরণ্যকেই মূল চরিত্র হিসেবে গড়ে তুলতে। কাজটা সহজসাধ্য ছিল না। এই চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখেই এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাষায় তিনি তাঁর স্বপ্নের উপন্যাসের (A novel on forests) প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন 'আরণ্যক'-এ। পটভূমিকা অবশ্যই তাঁর সেই জঙ্গলমহাল। ''ভাগলপুর শহরে ঘোষেদের জঙ্গলমহালের দোতলা সদর কাছাড়ি বাড়ি 'বড়বাসা'য় উঠলেন প্রথমে। সেখান থেকে তাঁকে যেতে হল শহর ছেড়ে প্রায় পনেরো ক্রোশ দূরে ডেরা ইসমাইলপুরে, জঙ্গলের অভ্যন্তরে খড়ের ছাউনি, মাটির দেয়ালের কাছাড়িতে। উত্তরে আজমাবাদ থেকে দক্ষিণে কিষেণপুর, পুবে ফুলকিয়া, লবটুলিয়া, নাড়াবইহার, আর পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমান্ত পর্যন্ত এই জঙ্গলমহাল। দিগ দেশহারা অরণ্যপ্রান্তর, দূরবিসর্পী শৈলশ্রেণী। জনাই ক্ষেত, মকাই ক্ষেত, চিনাঘাসের দানাভোজী দেহাতী জনশ্রেণী।''[১] এটাই 'আরণ্যক'-এর প্রেক্ষাপট। মূল চরিত্র সত্যচরণকে আমরা বিভূতিভূষণ বলেই চিনে ফেলি। সত্যচরণ-এর আরণ্যক-অনুভূতি তো বিভূতিভূষণ-এর দিনলিপি থেকেই অনেকাংশে উঠে এসেছে। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন - '' ভাগলপুরে থাকার সময়ে নিয়মিত দিনলিপি রাখতেন, ঠিক ডায়েরি নয়, বলা যায় journal - যার থেকে নির্বাচিত অংশ 'স্মৃতির রেখা' নামে পরে প্রকাশিত হয়। এই দিনলিপি ও তার খসড়ায় আমরা 'আরণ্যক'-এর প্রথম অঙ্কুর দেখতে পাই। 'স্মৃতির রেখা'য় উল্লিখিত বহু মানুষ এবং 'আরণ্যক'-এর চরিত্র অভিন্ন। বিশ্বসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কীভাবে লেখকের চিন্তায় দানা বাঁধে তা বোঝা যায় এই খসড়া পাঠ করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য রোমাঞ্চে চেতনা আচ্ছন্ন হয়।''[২] পুরো অরণ্যটাকে উপন্যাসে ধরে রাখবার জন্য বিভূতিভূষণ তাঁর স্পর্শকাতর মন, মেধা, অভিজ্ঞতা, দৃষ্টি এবং বিশ্বসাহিত্যের পাঠ একত্রিত করেছিলেন, অরণ্য-অনুসন্ধানে। জঙ্গলমহালে কাজের ফাঁকে ফাঁকে এবং কাজের মধ্যে মধ্যেই অরণ্য ও অরণ্যমানুষদের ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। অরণ্য-অঞ্চলের নতুন ভাষা, অপরিচিত শব্দ বা বাক্যরীতি, তাদের আরণ্যক সংস্কার ও জীবনযাত্রা, আরণ্যক গাছপালা পশুপাখির নাম, ইত্যাদি বোঝার চেষ্টা তো করছিলেনই, সেইসঙ্গে সেগুলো যাতে উপন্যাস লেখার সময় ভুলে না যান সেজন্য সংগ্রহ করছিলেন গভীর নিষ্ঠায়। স্বতঃস্ফূর্ততার অন্তরালে এক অরণ্য-গবেষক কাজ করে যাচ্ছিল। প্রকৃতিকে কত নিবিড়ভাবে বিভূতিভূষণ পর্যবেক্ষণ করেছেন - তার একটা দৃষ্টান্ত আমরা কৃতী গবেষক সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়-এর 'বিভূতিভূষণ ঃ জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থের 'প্রকৃতি

পরিচয়' শীর্ষক অধ্যায়ের দিকে তাকালে অবশ্যই বুঝতে পারবো। গবেষক শ্রীচট্টোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের রচনায় উল্লিখিত বিচিত্র উদ্ভিদের নাম ও তাদের বৈজ্ঞানিক নাম একত্রিত করেছেন অতন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে। প্রায় ৪২০টি উদ্ভিদের নাম সংকলিত হয়েছে।[১০] এই পর্যবেক্ষণ-শক্তি বিস্ময়কর। বিশ্বসাহিত্যে আর কোনো সাহিত্যিকের কলমে এভাবে প্রকৃতি আসেনি। আর, অরণ্যকে যে মর্যাদায় তিনি আনলেন, তা তার আগেও হয়নি, পরেও না।

'আরণ্যক' রচিত হয় ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে এবং ১৩৪৪ সনের কার্ত্তিক থেকে ১৩৪৫-এর ফাল্গুন পর্যন্ত 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পায়। পরে গ্রন্থাকারে বের হয়। অরণ্য এত প্রাধান্য পাওয়ায় বিভূতিভূষণের এই সৃষ্টির শ্রেণীনির্ণয় নিয়ে নানান বিতর্ক একসময় দানা বেঁধেছে। ডায়েরী, ভ্রমণকাহিনী, তত্ত্বমূলক কথাসাহিত্য ইত্যাদি নানান ধারার কথা প্রসঙ্গক্রমে এলেও এটি একটি উপন্যাসই, ভিন্ন আঙ্গিকের উপন্যাস। বিশিষ্ট গবেষক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন - ''বিভূতিভূষণের পূর্বে বাংলা উপন্যাস ছিল ইতিহাস, সমাজ ও রোমান্সনির্ভর। বিভূতিভূষণ লিখলেন পরিবেশ-নির্ভর উপন্যাস। তাঁর উপন্যাসের জাত আলাদা, যার উপর রুশো,মারী বারেলী এবং ইংরাজী রোমান্টিক কবিদের অরণ্য-চিন্তা, পরিবেশ-প্রণয় কাজ করেছিল। বাংলা উপন্যাসের প্রথাসিদ্ধ কোনো কোঠাতেই তাই 'আরণ্যক'কে স্থান দেওয়া যাবে না। অথচ এই উপন্যাসে একটি গল্প আছে, একাধিক নায়ক-নায়িকা আছে, লেখকের একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বদর্শন আছে, উপন্যাসের নিজস্ব ভাষাও আছে। তাই এই রচনাটিকে আরণ্যক-উপন্যাস বা পরিবেশ-প্রধান উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করাই যুক্তিসঙ্গত।''[১১]

ভাগলপুরের অরণ্যপ্রকৃতি ও অরণ্যবাসীরা কত গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্বে তাঁর অন্তরে জায়গা করে নিয়েছিল তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর 'আরণ্যক'। বই-এর শুরুতে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় বিভূতিভূষণ লিখেছেন - ''মানুষের বসতির পাশে কোথাও নিবিড় অরণ্য নাই। অরণ্য আছে দূর দেশে যেখানে পতিত-পক্ক জম্বুফুলের গন্ধে গোদাবরী-তীরের বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। 'আরণ্যক' সেই কল্পলোকের বিবরণ। ইহা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে - উপন্যাস। অভিধানে লেখে উপন্যাস মানে বানানো গল্প। অভিধানকার পন্ডিতদের কথা আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য। তবে 'আরণ্যক'-এর পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। কুশী নদীর অপর পারে

এরূপ দিগন্তবিস্তীর্ণ অরণ্যপ্রান্তর পূর্বে ছিল, এখনও আছে। দক্ষিণ ভাগলপুর ও গয়া জেলার বন পাহাড় তো বিখ্যাত।''[১২]

এই ভিন্নধর্মী উপন্যাসের ১৮টি পরিচ্ছেদকে ৭২টি পর্বে ভাগ করে বিভূতিভূষণ আরণ্যক 'এক একটি চরিত্রের জীবনের নির্যাস তুলে এনেছেন, কোথাও আবার চরিত্রের বদলে বিশাল অরণ্যের কোনো খন্ডিত চিত্র উপহার দিয়েছেন।'[১৩]

সত্যচরণ এক নগর-মানব - তাঁর স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে এই অরণ্য-উপন্যাসের শুরু। সারাদিন অফিসের খাটনির পর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের কাছে গড়ের মাঠে একটা বাদাম গাছের পাশে বসে তাঁর মনে হচ্ছে ''যেন লবটুলিয়ার উত্তর সীমানায় সরস্বতী কুন্ডীর ধারে সন্ধ্যাবেলায় বসিয়া আছি।''[১৪] একদা কর্মসূত্রে লবটুলিয়া, বইহার ও আজমাবাদের বনপ্রান্তরে তাঁকে থাকতে হয়েছে, ঘুরতে হয়েছে, কত ধরণের মানুষ দেখতে হয়েছে। কত আরণ্যক সৌন্দর্য্যের মুখোমুখি হতে হয়েছে। পনেরো-ষোল বছর আগের সেই আরণ্যক অভিজ্ঞতা সত্যচরণকে পিছু হাঁটতে বাধ্য করছে। A journey down memory lane। কলকাতার জনরণ্যে বসে সত্যচরণের স্মৃতিতে ভাসছে - ''...মহালিখারূপের পাহাড়ের পাদদেশে বিশাল বনপ্রান্তরে বসন্ত নামিয়েছে, লবটুলিয়া, বইহারের সর্বত্র হলুদ রঙের গোলগোলি ফুলের মেলা, দ্বিপ্রহরে তাম্রাভ রৌদ্রদগ্ধ দিগন্ত বালির ঝড়ে ঝাপসা, রাত্রে দূরে মহালিখারূপের পাহাড়ে আগুনের মালা, শালবনে আগুন দিয়াছে। কত অতিদরিদ্র বালক বালিকা, নরনারী, কত দুর্দান্ত প্রকৃতির মহাজন, গায়ক, কাঠুরে, ভিখারীর বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল।...''[১৫] কিন্তু এই বিচিত্র স্মৃতির সঙ্গে মিলে আছে গভীর বেদনার ভার। বেকারত্বের জ্বালা থেকে অব্যাহতি চেয়ে একদিন নাগরিক সত্যচরণ বেছে নিয়েছিলেন অরণ্যে নির্বাসিত জীবন। ত্রিশ হাজার বিঘের জঙ্গল নূতন-প্রজাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করার দেখভালের গুরুদায়িত্ব । সেই অরণ্য ক্রমে-ক্রমে জীবন্ত সত্তায় তাঁর কাছে প্রতিভাত হল। জঙ্গলের প্রেমে আচ্ছন্ন হয়েও কাজের দায়িত্বে অরণ্যধ্বংসের অনুমতি তাঁকেই দিতে হয়েছিল। সত্যচরণের এক confession-এর মধ্য দিয়েই 'আরণ্যক'-এর মূল কাহিনীর সূত্রপাত। আমরা বুঝতে পারি এ আসলে বিভূতিভূষণের নিজেরই confession। কলকাতায় এক বিমর্ষ সন্ধ্যায় সত্যচরণ ভাবছেন - ''কিন্তু আমার এ স্মৃতি আনন্দের নয়, দুঃখের। এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার নিজের হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল, বনের দেবতারা সেজন্য আমায় কখনো

ক্ষমা করিবেন না জানি। নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে অপরাধের ভার লঘু হইয়া যায়। তাই এই কাহিনীর অবতারণা।''[১৬] সত্যচরণ অরণ্যে গেলেন জঙ্গল ধ্বংস করে চাষ-আবাদের জন্য জমি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলিবন্টন করার দায়িত্ব নিয়ে। প্রথমাবস্থায় অরণ্য নাগরিক মানুষের কাছে কখনো বাসযোগ্য মনে হয় না। বরঞ্চ অসহনীয় লাগে। সত্যচরণও তার ব্যতিক্রম নন। - ''চাকুরীর কয়েকটি টাকার খাতিরে যেখানে আসিয়া পড়িলাম, এত নির্জন স্থানের কল্পনাও কোনদিন করি নাই। দিনের পর দিন যায়, পূববাকাশে সূর্য্যের উদয় দেখি দূরের পাহাড় ও জঙ্গলের মাথায়, আবার সন্ধ্যায় সমগ্র বনঝাউ ও দীর্ঘ ঘাসে বনশীর্ষ সিঁদুরের রঙে রাঙাইয়া সূর্য্যকে ডুবিয়া যাইতে দেখি - ইহার মধ্যে শীতকালের যে এগার-ঘন্টা ব্যাপী দিন, তা যেন খাঁ-খাঁ করে শূন্য কি করিয়া তাহা পুরাই প্রথম প্রথম সেইটা আমার পক্ষে হইল মহা সমস্যা। কাজকর্ম করিলে অনেক করা যায় বটে, কিন্তু আমি নিতান্ত নব আগন্তুক, এখনো ভাল করিয়া এখানকার লোকের ভাষা বুঝিতে পারি না, কাজের কোন বিলিব্যবস্থাও করিতে পারি না, নিজের ঘরে বসিয়া বসিয়া যে কয়খানি বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম তাহা পড়িয়াই কোন রকমে দিন কাটাই, কাছারিতে লোকজন যারা আছে তারা নিতান্ত বর্বর, না বোঝে তাহারা কথা না আমি ভাল বুঝি তাহাদের কথা, প্রথম দিন-দশেক কি কষ্টে যে কাটিল। কতবার মনে হইল চাকুরিতে দরকার নাই, এখানে হাঁপাইয়া মরার চেয়ে, আধপেটা খাইয়া কলকাতায় থাকা ভাল।''[১৭] অর্থাৎ জঙ্গলের নির্জনতা, একাকিত্ব নাগরিক-মনকে আশঙ্কিত করলো। অরণ্যের গভীরে নিজেকে না সঁপে দিতে পারলে অরণ্য সঠিক পরিধিতে ধরা দেয় না। মননশীল যে মানুষেরা অরণ্যকে ভালোবাসতে পেরেছেন অরণ্য তাদের খালি হাতে ফেরায়নি। বিভূতিভূষণ নিজেই তার চরম দৃষ্টান্ত। অরণ্যে ১৭-১৮ বছর কাটানো জঙ্গলমহালের মুহুরী গোষ্ঠ চক্রবর্ত্তী তাই সত্যচরণকে বলেন - '' নতুন এসেছেন কলকাতা থেকে, কলকাতার জন্যে মন উড়ু উড়ু করছে, বয়সও আপনার কম। কিছুদিন এখানে থাকুন। তার পর দেখবেন। ...জঙ্গল আপনাকে পেয়ে বসবে। কোন গোলমাল কি লোকের ভিড় ক্রমশ আর ভাল লাগবে না।''[১৮]

জঙ্গল কিভাবে একজন মরমী মানুষকে কত গভীরে পেয়ে বসে, কত অপার সম্পদ উজাড় করে দেয় তারই অসাধারণ কাহিনী 'আরণ্যক'। অরণ্যের অনুক্ষণ সান্নিধ্যে কিভাবে নগর-মানুষ সত্যচরণের ক্রম-রূপান্তর ঘটছে, কিভাবে তিলে তিলে তিনি ভালোবাসতে শিখছেন আরণ্যক প্রকৃতি ও জীবনকে, কিভাবে অরণ্য-সান্নিধ্যে তাঁর মন প্রসারিত হচ্ছে তারই নিপুণ দলিল এই

উপন্যাস। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শুরুতে যে সত্যচরণের মনে হচ্ছে - ''এই অরণ্য-ভূমির নির্জনতা যেন পাথরের মতো বুকে চাপিয়া আছে''[১৯], এই পরিচ্ছেদেরই তৃতীয় পর্বের শুরুতে তাঁকেই আবার বলতে শোনা যায় - ''দিন যতই যাইতে লাগিল, জঙ্গলের মোহ ততই আমাকে ক্রমে পাইয়া বসিল। এর নির্জনতা ও অপরাহ্নের সিঁদুর-ছড়ানো বনঝাউয়ের জঙ্গলের কি আকর্ষণ আছে বলিতে পারি না - আজকাল ক্রমশঃ মনে হয় এই দিগন্তব্যাপী বিশাল বনপ্রান্তর ছাড়িয়া, ইহার রোদপোড়া মাটির তাজা সুগন্ধ এই স্বাধীনতা, এই মুক্তি ছাড়িয়া কলিকাতার গোলমালের মধ্যে আর ফিরিতে পারিব না।''[২০] যে আরণ্যক অশিক্ষিত মানুষগুলোকে তাঁর দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল, ক্রমশঃ তারা তাঁর কাছে স্পষ্ট হল। আর সেই স্পষ্টতা সত্যচরণের মনে এই জাত সম্পর্কে মুগ্ধতা ও শ্রদ্ধার জন্ম দিল। তিনি এদের ভালোবাসতে শিখলেন - ''কেন জানি না, ইহাদের হঠাৎ এত ভাল লাগিল ! ইহাদের দারিদ্র, ইহাদের সারল্য, কঠোর জীবনসংগ্রামে ইহাদের যুঝিবার ক্ষমতা - এই অন্ধকার অরণ্যভূমি ও হিমবর্ষী মুক্ত আকাশ বিলাসিতার কোমল পুষ্পাস্তৃত পথে ইহাদের যাইতে দেয় নাই, কিন্তু ইহাদিগকে সত্যকার পুরুষমানুষ করিয়া গড়িয়াছে।''[২১] এইভাবে ক্রমাগত উপলব্ধি এক নাগরিক-মানুষকে আরণ্যক মানুষদের কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে। বুনো মানুষগুলোর কাছে জঙ্গলমহালের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এক সম্ভ্রমের বস্তু, প্রায় দেবতাতুল্য, কিন্তু সত্যচরণ নিজেকে ক্রমশঃ তাদের নৈকট্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এখানে বিভূতিভূষণ নিজের অন্তর্সত্তাকে সত্যচরণের ওপর আরোপ করেছেন। নইলে সত্যচরণ নিছক তাঁর কাজই করে যেত। জঙ্গলের অধিবাসীদের অবজ্ঞা করার বদলে তাদের তিনি আপন করে নেবার চেষ্টা করছেন, তাদের অবর্ণনীয় দারিদ্র্যে কষ্টে তিনিও সমান কষ্ট পাচ্ছেন। তিনি দেখছেন ভয়ানক শীতে প্রায় বিনা বস্ত্রে পার্বত্য পথ ধরে ন-মাইল হেঁটে বিনা নিমন্ত্রণে একটু ভাত খাবার আশায় তারা ফুলকিয়ার কাছারিতে হাজির হচ্ছে, নতুন ম্যানেজার এসেছে এই আনন্দে। এদের ভাত জোটে বহু মাস পরে। পাঁচ মোষ সম্বল করে গনু মাহাতো-র মতো লোকেরা অরণ্যের অন্দরে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করছে, যে কোনো সময় বুনো জন্তুর আক্রমণে প্রাণ যেতে পারে। গনুর মুখ দিয়ে বিভূতিভূষণ এদের দারিদ্রকে নির্মমভাবে এঁকেছেন - '' এই জঙ্গলের পেছনে আমার দু-বিঘে খেড়ী ক্ষেত আছে। খেড়ীর দানা সিদ্ধ আর জঙ্গলে বাথুয়া শাক হয়, তাই সিদ্ধ, আর একটু নুন, এই খাই। ফাগুন মাসে জঙ্গলে গুড়মী ফল ফলে, নুন দিয়ে কাঁচা খেতে বেশ লাগে - লতানে গাছ, ছোট ছোট কাঁকুড়ের মত ফল হয়, সে সময় এক মাস এ অঞ্চলের যত গরীব লোক গুড়মী ফল খেয়ে কাটিয়ে দেয়।''[২২] রাসবিহারী সিং রাজপুত ও নন্দলাল পাঁড়ে-র মতো মহাজনেরা শুধুমাত্র

দুবেলা ভাত খায়, বাকীরা অনাদিকাল থেকে অনাহারে অর্ধাহারে থাকে। অরণ্যই তাদের সামান্য খাদ্য জোগান দেয়। ফসল কাটা হয়ে গেলে ক্ষেতে গম বা যবের যে শীষ পড়ে থাকে তা কুড়িয়ে, বুনো কুল পেড়ে বহু কষ্টে তাঁর সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়। প্রবলতম ঠান্ডা শীতের রাতে ম্যানেজারবাবুর খাবারের অবশিষ্টাংশ নিয়ে যাবে বলে কাছারির এক অন্ধকার প্রান্তে সে উদগ্রীব দাঁড়িয়ে থাকে। অথচ এত দারিদ্র্যও তার অন্তরের সুকোমল বৃত্তিগুলোকে নষ্ট করতে পারেনি। কুষ্ঠ রোগী গিরিধারীলালকে সবাই দূরে ঠেলে দিলেও এক গভীর মানবিক বোধে সে নিঃসঙ্কোচে তার সেবার ভার নেয়। আরণ্যক লোকশিল্পী 'ধাতুরিয়া'র নাচের মজুরী মাত্র দু আনা আর আধ সের মকাইসেদ্ধ , তবু গাঙ্গোতাদের বাড়ীতে নিয়মিত ডাক সে পায় না। একটু খাবারের আশায় তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সরল আনন্দে। অভাব-অনটনে ক্লিষ্ট এই লোকশিল্পী অরণ্য ছেড়ে নগর-কলকাতায় যাবার স্বপ্ন দেখে। কাটনি মেলায় গিয়ে আরণ্যক সরল মানুষগুলো শুধু ঠকে, মক্ষীর মতো সোজা রেল মেয়েও মনোহারী সামগ্রীর দোকানদারদের দ্বারা ঠকে আসে। রাসবিহারী সিং রাজপুতদের মতো ধনী লোভী নগর-মানুষগুলো এদের চুষে নেয়। এমনকি এই পুঁজিপতিদের লালসার শিকার হয় নিষ্পাপ সরল মেয়েরা। নন্দলাল ওঝা-র মতো মুখোসধারী লোকেরা টাকার লোভ দেখিয়ে জঙ্গলের মানুষগুলোর সর্বনাশ করছে, সর্বস্বান্ত করছে। অথচ মানুষগুলোর অভিযোগ করার ভাষাটাও নেই। ভয়াবহ জীবনকে হাসিমুখে মেনে নেয়। নিদারুণ পরিশ্রম করে কাঠ পুড়িয়ে কয়লা বানিয়ে চার সের পয়সায় বিক্রি করেই কারো কারো জীবিকা নির্বাহ হয়। এইভাবে 'আরণ্যক'-এর পাতায় পাতায় বিভূতিভূষণ অরণ্যচারী মানুষগুলোর প্রতি শোষণ ও অবিচারের ছবি মূর্ত করেছেন একান্ত শৈল্পিক ঢঙে, অথচ যা মর্মস্পর্শী। অরণ্যের প্রতি বঞ্চনার এ ইতিহাসের পর্দা উন্মোচিত হয় নানান কাহিনীবিন্যাসে। এত যন্ত্রনাময়তার পাশাপাশি কিছু কিছু দৃশ্য আমাদের স্পন্দিত করে। অসাধারণ মানবিকতার আখ্যান হয়ে ওঠে 'আরণ্যক' কিছু অপূর্ব চরিত্রের মধ্য দিয়ে। অরণ্যপ্রেমী যুগলপ্রসাদ অরণ্যকে ভালোবাসার চরমতম দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। নিঃস্বার্থ অগাধ প্রেমে এই মানুষটি অরণ্যের আত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে। বনে-জঙ্গলে নিজের মনে সে ঘুরে বেড়ায়, তার স্বপ্ন অরণ্যকে আরো শ্যামল করে তোলা, আরো সৌন্দর্যময়ী করে তোলা। এ কাজের দায়িত্ব সে নিজেই নিজেকে দিয়েছে। আবার নিষ্ঠাভরে তা পালনও করে চলেছে। ছোট একটি কোদাল এবং শাবল নিয়ে যুগলপ্রসাদ বনে বনে ঘুরে বেড়ায় নতুন গাছ পুঁতবার জন্য। সে বলে - ''লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গলটা ভারি চমৎকার জায়গা - ওই ছোটখাটো পাহাড়ের গায়ে কি এখানকার বনে-ঝোপে নতুন-নতুন ফুল ফোটাব এ আমার

বহুদিনের শখ।''[২৩] অরণ্যের প্রতিটি গাছপালা, ফুল-লতার সঙ্গে তার পরিচয়। সরস্বতী কুন্ডীর ধারে অক্লান্ত পরিশ্রমে সে গাছ লাগিয়ে চলেছে। অথচ কেউ দেখবারও নেই - পুরস্কৃত করবারও। বনদপ্তর তাকে এ কাজের দায়িত্ব দেয়নি। বিভূতিভূষণের **alter ego** সত্যচরণের সঙ্গে তাই অনায়াসে যুগলপ্রসাদের অন্তরের মিল হয়ে যায়। সমালোচক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী লিখেছেন -''দুই অরণ্যপ্রেমিকের মধ্যে প্রথম দর্শনেই হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হল।''[২৪] অরণ্যের প্রতি সত্যচরণের আগ্রহ আরো বেড়ে গেল এই যুগলপ্রসাদের অরণ্যপ্রীতির অনুষঙ্গে। - ''তাহার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। লোকটা সম্পূর্ণ বিনাস্বার্থে একটা বিস্তৃত বন্যভূমির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করিতেছে, যে বনে তাহার নিজের ভূস্বত্ব কিছুই নাই - কি অদ্ভুত লোকটা !...তাহার জ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। নিছক সৌন্দর্য্যের এমন পূজারীই বা কটা দেখিয়াছি? বনে বনে ভাল ফুল ও লতার বীজ ছড়াইয়া তাহার কোন স্বার্থ নাই, এক পয়সা আয় নাই, নিজে সে নিতান্তই গরীব, অথচ শুধু বনের সৌন্দর্য্য-সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টায় তার এ অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্বেগ।''[২৫] অরণ্যসৃজনের স্বপ্নে সত্যচরণ (যার ওপর অরণ্যধ্বংসের ভারী দায়িত্ব) যুগলপ্রসাদের দ্বারাই অনুপ্রাণিত। সরস্বতী কুন্ডীর তীরোবর্ত্তী অরণ্য একদিন ধ্বংস হতে চলেছে এই ভাবনায় যুগলপ্রসাদকে সঙ্গে করে তিনি মহালিখারূপ পাহাড়ে বনসৃজনের নেশায় মেতে ওঠেন। 'আরণ্যক' উপন্যাসের যুগলপ্রসাদ তাই নিছক একটি চরিত্র নয়, সে অরণ্যের সৌন্দর্য্যের আত্মা।

আরণ্যক এলাকার অর্থনীতিতে যেমন রয়েছে রাসবিহারী সিং রাজপুত, নন্দলাল ওঝা ও বীরবল সিং - তেমনি রয়েছেন 'লোকোত্তর চরিত্রের মানুষ' ধাওতাল সাহু। মহাজন অথচ মহাপুরুষতুল্য। আরণ্যক এই মহাজন এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। সুদে টাকা খাটানোর ব্যবসা থাকলেও যিনি অর্থপিশাচ নন। তাঁর সঙ্গে অরণ্যের কোলেই সত্যচরণের প্রথম আলাপ - ''সার্ভে-ক্যাম্প থেকে একদিন ঘোড়া করিয়া ফিরিতেছি, বনের মধ্যে একটা লোক কাশঘাসের ঝোপের পাশে বসিয়া কসাইয়ের ছাতু মাখিয়া খাইতেছে। পাত্রের অভাবে ময়লা থান কাপড়ের প্রান্তেই ছাতুটা মাখিতেছে।''[২৬] একজন 'লক্ষপতি' মহাজনের এই অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা অবাক করে বইকি ! টাকা ধার দিয়ে তিনি তাগাদা করতে পারেন না। তার টাকা অজস্র লোক ফাঁকি দেয়। হাজার হাজার টাকার দলিল তদ্বিরের অভাবে 'তামাদি' হয়ে যায়। তবু ধাওতাল সাহুর আপসোস বা অভিযোগ নেই। এমন অর্থ-উদাসীন মহাজন বাংলাসাহিত্যে সম্ভবতঃ আর আসেনি। সত্যচরণের তাই বনে হয়েছে - ''বিত্তে নিস্পৃহতা ও বৃহৎ ক্ষতিকে তাচ্ছিল্য

করিবার ক্ষমতা যদি দার্শনিকতা হয় তবে ধাওতাল সাহুর মতো দার্শনিক আমি তো অন্ততঃ দেখি নাই।''[২১] আরণ্যক পটভূমিকায় ধাওতাল যেন অরণ্যের মতো বিশাল, অথচ উদাসীন।

জঙ্গলের অন্দরে আরেক দার্শনিক চরিত্র উঠে এসেছে। রাজু পাঁড়ে। বিষয়-সম্পত্তির লোভ ও জটিলতা থেকে তাঁর মন অনেক উর্দ্ধে। পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্নের এই গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ সত্যচরণের দয়ায় জঙ্গলমহালে লবটুলিয়া-বইহারের উত্তরে মাত্র দু-বিঘে আরণ্যক জমি পান একরকম বিনামূল্যেই। কথা ছিল জঙ্গল কেটে তিনি জমিকে চাষ-আবাদের যোগ্য করে তুলবেন। কিন্তু দেড় বছরের মধ্যেও তিনি জঙ্গল কাটার কাজে হাত দিতে পারেননি। দিতে চানও নি। এই দার্শনিক চরিত্রের মগ্ন-দার্শনিকতা আরো গভীরতর রূপ পেয়েছে নিবিড় অরণ্যের সান্নিধ্যেই। তাঁর অন্তরের অন্তরস্থ কবি-মন তাঁকে বাধা দেয় অরণ্য কেটে নষ্ট করতে। তাই সত্যচরণ যখন তাঁর নিস্পৃহতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তখন রাজু গভীর বোধ থেকে বলেন - ''জঙ্গল কাটতে গিয়ে কত কথা মনে পড়ে, বসে বসে ভাবি। এই যে বনজঙ্গল দেখছেন, বড় ভাল জায়গা। ফুলের দল কত কাল থেকে ফুটছে আর পাখী ডাকছে, বাতাসের সঙ্গে মিলে দেবতারা মাটিতে পা দেন এখানে। টাকার লোভ, পাওনাদেনার কাজ যেখানে চলে, সেখানকার বাতাস বিষিয়ে ওঠে। সেখানে ওঁরা থাকেন না। কাজেই এখানে দা-কুড়ুল হাতে করলেই দেবতারা এসে হাত থেকে কেড়ে নেন - কানে চুপি-চুপি এমন কথা বলেন যাতে বিষয়-সম্পত্তি থেকে মন অনেক দূরে চলে যায়।''[২২] এই সাত্বিক, অরণ্যপ্রেমিক চরিত্র অরণ্যধ্বংশ না করে মাসের পর মাস চীনাঘাসের দানা খেয়েই হাসিমুখে কাটিয়ে দিচ্ছেন। এক হরিতকী গাছের নীচে চুপচাপ বসে বন ও পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেন। অরণ্যের কোলে তাঁর মধ্যে শান্ত ঈশ্বরচিন্তা কাজ করে। **William Wordsworth** যেন তাঁর মধ্য দিয়ে কথা বলেন। ঈশ্বরভাবনার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মধ্যে এক মানবপ্রেমিকও লুক্কায়িত। তাই অরণ্য-জনপদের মানুষেরা যখন তীব্র কলেরায় আক্রান্ত, রাজু পাঁড়ে শিকড়-বাকড় জরিবুটি নিয়ে বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেবা করছেন। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত গিরিধারীলালকে যখন বস্তি থেকে বের করে দেওয়া হয়, অসহায় সেই রোগীর চিকিৎসার ভারও তিনিই গ্রহণ করেন। রাজু পাঁড়ে 'আরণ্যক'-এর সম্পদও বটে।

অরণ্যের প্রভাব যেন সরাসরি পড়ে বিভিন্ন চরিত্রের ওপর। রাসবিহারী সিং পেয়েছে অরণ্যের হিংস্রতা, ধাওতাল সাহু পেয়েছে অরণ্যের বিশালতা ও উদাসীনতা, রাজু পাঁড়ে পেয়েছে কবিত্ব, দার্শনিকতা ও ঈশ্বরবোধ, যুগলপ্রসাদ পেয়েছে সৌন্দর্যবোধ।

বিভূতিভূষণের দরদী লেখনিতে এমন অসংখ্য চরিত্র উঠে এসেছে, যারা অরণ্যে রয়েছেন তাদের সরলতা, সংগ্রাম, দার্শনিকতা, ক্রূরতা, লোভ ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় মানব-গুণাবলী নিয়ে। ব্রাহ্মণ-সংস্কৃতজ্ঞ মটুকনাথ পাঁড়ে অরণ্যের অভ্যন্তরে ছাত্র পড়াবার টোল খোলেন নির্মল স্বপ্নে ও আনন্দে। নির্ভেজাল অধ্যবসায়ে তিনি আদিবাসী ছেলেদের নিয়ে জঙ্গলমহালের পাশে বিদ্যায়তন তৈরী করলেন। কিন্তু তাঁর মহৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় ছেলেদের চাঞ্চল্য ও অসততায়। তবু তিনি সদানন্দ। - অরণ্যে বসে কবি হবার স্বপ্ন দেখেন বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ। এই আত্মভোলা মানুষটি 'আরণ্যক'-এর জনারণ্যে স্বতন্ত্র।

অরণ্যের কোলে বিচরণশীল তিন শ্রেণীর মানুষকে আমরা 'আরণ্যক'-এ দেখতে পাই। রসজ্ঞ সমালোচক ও অধ্যাপক প্রীজিতেন্দ্রলাথ চক্রবর্ত্তী এই বিভাজন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন - একশ্রেণীর নরনারী অরণ্যক্ষেত্র থেকেই উদ্ভূত - কেউ কেউ সেখানকারই ফসল, কেউ কেউ বা উপজাত বস্তুমাত্র -Product or by-product ।

সত্যকার ফসল বলবো ধাওতাল সাহু, রাজু পাঁড়ে, গনোরি তেওয়ারি, গনু মাহাতো, যুগলপ্রসাদ, ভানুমতী প্রভৃতি মানুষকে, যারা অরণ্য-জীবনের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে - যারা না থাকলে অরণ্যকেও বুঝি আংশিক অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। আর উপজাত মানুষ হল তারা যারা হয় বাইরে থেকে ছিটকে অরণ্য-জীবনের মধ্যে এসে পড়েছে অথবা এই জীবনের মধ্যেই তার বিরোধী শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছে, যেমন কুন্তী, মঙ্কী, ধাতুরিয়া, মটুকনাথ পাঁড়ে অথবা নন্দলাল ওঝা ও রাসবিহারী সিং রাজপুত।

''এছাড়া আরও একশ্রেণীর মানুষের কথা বলা হয়েছে। এরা এই অরণ্য অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসী নয় - বাড়ীঘর বলতে যা বোঝায় তা এদের নেই বললেই হয়। প্রায় সারা বছরই দেশময় ঘুরে বেড়ায়। এরা কাটুনী মজুরের দল। আদিম প্রাগৈতিহাসিক যুগে যাযাবরদের মতো জীবনযাপন করে এরা।...ফসল কাটা শেষ হয়ে গেলে কুঁড়েঘর ফেলে রেখে দিয়ে সপরিবারে স্থানান্তরে চলে যায়।পরের বৎসর বা অন্য ফসল পাকলে আবার আসে।...এদের সদা ভ্রাম্যমান জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগ নেই। অরণ্য-প্রকৃতিকে তো এরা চেনেই না,...এইসব মানুষের জীবনকে প্রকৃতি নানা দিক থেকে প্রভাবিত করেছে, এবং অনেক সময় তার ফল হয়েছে অতি বিচিত্র।''[২৯]

এই অসংখ্য মানুষের মধ্যে পরিষ্কার পারস্পরিক সংযোগ না থাকলেও অরণ্যের সামগ্রিক

চেহারা ফুটিয়ে তুলতে এরা বিশাল ভূমিকা নিয়েছে। ছিন্নছিন্ন চরিত্রগুলো গ্রন্থিত হয়ে অবিচ্ছিন্ন এক আরণ্যক সত্তা উঠে এসেছে।

তবে এত অসংখ্য চরিত্রের মধ্যেও দোবরু পান্না ও তাঁর উত্তরসূরীরা হয়ে উঠেছেন অরণ্যের মূল কেন্দ্রীভূত চরিত্র। এই উপকাহিনী অরণ্যের আদিম মানবগোষ্ঠীর মুখোমুখি দাঁড় করায় পাঠকদের। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন - ''দোবরু পান্না অরণ্যভূমির আত্মা, 'আরণ্যক'উপন্যাসেরও আত্মা। ভানুমতী অরণ্যভূমির সৌন্দর্যের প্রতীক। দোবরু পান্না মর্যাদার প্রতীক। লেখক সৌন্দর্যের মর্যাদা ও মর্যাদার সৌন্দর্য্য উভয়কেই নিঃসঙ্কোচে রূপায়িত করেছেন। পরাভূত দোবরু পান্না বিপর্যস্ত হলেও, সে রাজা এবং অতীত সংগ্রামের নায়ক, একথাটা লেখক কদাচ বিস্মৃত হন নি। যৌবন বয়সে কোম্পানীর সঙ্গে লড়েছেন দোবরু পান্না, তাঁর পূর্বপুরুষেরা লড়েছেন মুঘল সাম্রাজ্যবাহিনীর সঙ্গে। সূর্য বংশের সন্তান তিনি, একদা তাঁর বংশের অধীনে ছিল ঐ পাহাড় জঙ্গল সারা পৃথিবী। দোবরু পান্নাকে রাজসম্মান দিয়েছেন লেখক।''[৩০] উত্তরে হিমালয় পাহাড় ও দক্ষিণে ছোটনাগপুরের সীমানা, পূর্বে কুশী নদী, পশ্চিমে মুঙ্গের - এই ব্যাপ্ত অঞ্চলের জঙ্গলের আধিপত্য ছিল দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের। অনার্য সাঁওতাল প্রজাতির এই বিজিত রাজার মুখোমুখি শুধুমাত্র সত্যচরণই হন না, তাঁর সাথে সাথে বিভূতিভূষণ সমগ্র পগর-সভ্যতাকে দাঁড় করান এক গোষ্ঠীর সামনে, যাঁরাই আসলে ভারতীয় সভ্যতার মূল স্তম্ভ। আরণ্যক জীবনযাত্রা থেকে সভ্যতার পথচলা শুরু, অথচ সেই আরণ্যক আদিবাসীরা শোষিত, নিপীড়িত, পরাভূত। এই তীব্র সভ্যতার সংকটকে হাজির করে বিভূতিভূষণ তথাকথিত নগর-সভ্যতার লোভ-লালসা-অবিচারের জন্য আদিম এই জনগোষ্ঠির কাছে ক্ষমা চাইতে চেয়েছেন। দুই সভ্যতার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। আদিম এই মানব-গোষ্ঠীর প্রতি কোনো অবহেলা নয়, অসীম শ্রদ্ধা উজাড় করেছেন। এখানে 'আরণ্যক'উপন্যাস অত্যন্ত অর্থবাহী হয়ে ওঠে। অরণ্যের কোলে প্রাচীনতম রাজসমাধির সামনে দাঁড়িয়ে মানসচোখে সত্যচরণ দেখতে পাচ্ছেন এবং অনুভব করছেন -''...যাযাবর আর্য্যগণ উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া স্রোতের মত অনার্য্য আদিমজাতি-শাসিত প্রাচীন ভারতে প্রবেশ করিতেছেন... ভারতের পরবর্ত্তী যা কিছু ইতিহাস - এই আর্য্যসভ্যতার ইতিহাস - বিজিত অনার্য্য জাতিদের ইতিহাস কোথাও লেখা নাই - কিংবা সে লেখা আছে এইসব গুপ্ত গিরিগুহায়, অরণ্যানীর অন্ধকারে , চূর্ণায়মান অস্থিকঙ্কালের রেখায়। সে লিপির পাঠোদ্ধার করিতে বিজয়ী আর্য্য জাতি কখনো ব্যস্ত হয় নাই। আজও বিজিত হতভাগ্য জাতিগণ তেমনই অবহেলিত, অবমানিত, উপেক্ষিত। সভ্যতাদর্পী আর্য্যগণ তাহাদের দিকে

কখনো ফিরিয়া চাহে নাই, তাহাদের সভ্যতা বুঝিবার চেষ্টা করে নাই,আজও করে না। আমি, বনোয়ারী সেই বিজয়ী জাতির প্রতিনিধি। বৃদ্ধ দোবরু পান্না, তরুণ যুবক জগরু, তরুণী কুমারী ভানুমতী সেই বিজিত পদদলিত জাতির প্রতিনিধি - উভয় জাতি আমরা এই সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি - সভ্যতার গর্বে উন্নতনাসিক আর্য্যকান্তির গর্বে আমি প্রাচীন অভিজাতবংশীয় দোবরু পান্নাকে বৃদ্ধ সাঁওতাল ভাবিতেছি, রাজকন্যা ভানুমতীকে মুন্ডা কুলী রমণী ভাবিতেছি - তাদের কত আগ্রহের ও গর্বের সহিত প্রদর্শিত রাজপ্রাসাদকে অনার্য্যসুলভ আলোবাতাসহীন গুহাবাস, সাপ ও ভূতের আড্ডা বলিয়া ভাবিতেছি। ইতিহাসের এই বিরাট ট্রাজেডী যেন আমার চোখের সম্মুখে সেই সন্ধ্যায় অভিনীত হইল - যে নাটকের কুশীলবগণ একদিকে বিজিত উপেক্ষিত দরিদ্র অনার্য্য নৃপতি দোবরু পান্না, তরুণী অনার্য্য রাজকন্যা ভানুমতী,তরুণ রাজপুত্র জগরু পান্না - একদিকে আমি, আমার পাটোয়ারী বনোয়ারীলাল ও আমার পথপ্রদর্শক বুদ্ধু সিং।''[৩৯] বিভূতিভূষণ তাঁর 'আরণ্যক'কে এই পর্বে চিরকালীন মহিমায় উন্নীত করেছেন। সত্যচরণকে দিয়ে তিনি যে অসাধারণ কাজটি করিয়েছেন এই আদিম মানবগোষ্ঠীর কাছে শ্রদ্ধানত করিয়ে, তা 'আরণ্যক'কে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রভূমিতে অনেক উঁচু স্থান দিয়েছে। আরণ্যক রাজকন্যা ভানুমতীর নগ্ন নিটোল সৌন্দর্য্যময় উপস্থিতি বিভূতিভূষণের ভেতরকার প্রচ্ছন্ন রোমান্টিকতাকে বাঙ্ময় করে তোলে। ভানুমতী যেন অরণ্যের প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। অরণ্যকে যেমন নিবিড়ভাবে লেখক ভালোবেসেছিলেন, কখন নীরবে এই অরণ্যবালিকার প্রেমেও আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। তবে অরণ্যকে ভালোবাসবার মতোই এ প্রেম উদ্ধত নয়, শরীরী নয়, বরঞ্চ বড়ো কাব্যিক, মিষ্টি, বেদনাময়। স্পর্শহীন সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি ভানুমতী। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন - '''আরণ্যক'-এ প্রেম আছে, কিন্তু তা নিসর্গের সঙ্গে নিসর্গপূজারীর প্রেম। শরীর- নির্ভর পার্থিব প্রেমের চাইতে যা অনেক বেশী সুদূরপ্রসারী। বিভূতিভূষণ তাঁর সাহিত্যে কোথাও শরীর ও যৌনতাকে প্রাপ্যের অধিক প্রাধান্য দেন নি। ...ভানুমতী স্থানীয় নিসর্গের মূর্ত্ত প্রতিনিধি, সহজ স্বাভাবিক নারীত্বের প্রতিনিধি, আর বিভূতিভূষণ তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে নিসর্গের পূজা করেছেন, শরীরী কামনা নিয়ে জৈব সংসর্গে আসতে চাননি। এলে 'আরণ্যক'হয়তো কেবল একটি সুলিখিত উপন্যাস হয়েই থাকতো, বিশ্বসাহিত্যের অনবদ্য এক ধ্রুপদী সৃষ্টিতে পরিণত হত না।''[৪০] ভানুমতী তবু উন্মোচন করে দেয় বিভূতিভূষণ-এর মনের এক অচেনা দিককে। অরণ্য ও ভানুমতী একাকার হয়ে তাঁকে মোহময় টানে টেনে নেয় নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে। - ''এ দেশের প্রান্তর যেমন উদার, অরণ্যানী, মেঘমালা, শৈলশ্রেণী যেমন মুক্ত ও দূরচ্ছন্দা - ভানুমতীর

ব্যবহার তেমনি সঙ্কোচহীন, সরল, বাধাহীন, মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের মতো স্বাভাবিক। ...অরণ্য ও পাহাড় এদের মনকে মুক্তি দিয়াছে, দৃষ্টিকে উদার করিয়াছে - এদের ভালবাসাও সে অনুপাতে মুক্ত, দৃঢ়, উদার। মন বড় বলিয়া এদের ভালবাসাও বড়।''[৩৩] ষোলো বছর বয়সের এক নবযৌবনা আরণ্যক মেয়ের রূপও তো সত্যচরণকে মোহিত করেছিল। তবে বিভূতিভূষণ-এর কলমে তা কখনো দেহজ হয়ে ওঠেনি। সত্যচরণ তার জন্য পূর্ণিয়া থেকে একটি ভালো আয়না কিনে পাঠাচ্ছে। এই আরণ্যক কিশোরীর কাছে একটি সামান্য আয়নাই দুর্লভ। আর সত্যচরণ কিংবা বিভূতিভূষণ নিজে ভাবছেন - ''তবে আয়নার সৃষ্টি হইয়াছে কাদের জন্যে ?''[৩৪] একটি মেয়ে হয়েও ভানুমতী অত্যন্ত সহজভাবে মিশে গেছেন সত্যচরণের সাথে। এই সহজতা আরণ্যক সারল্যের কারণেই ঘটেছে। যা অরণ্যবাসীদের সম্পদও বটে। আবার এই সারল্যের সুযোগ নিয়েই কপট নগরসভ্যতা এদের শুষে নেয়। সত্যচরণ সে দলের নন। তাই বনের রাজা দোবরু পান্নার মৃত্যুর পর যখন মহাজন বীরবর সিং টাকার দেনার অজুহাতে তাদের গরু-মোষ আটক করে (যার দুধের ঘি বিক্রি করে রাজপরিবারের অন্নসংস্থান হত), সত্যচরণ তখন স্বতঃপ্রবৃত হয়ে এগিয়ে যান এই অসহায় পরিবারকে বাঁচাতে। নগর-মানুষের সাথে আদিম এক অরণ্য-গোষ্ঠীর মেলবন্ধনের অকৃত্রিম চেষ্টা করেছেন বিভূতিভূষণ। সত্যচরণ তাই ভাবছেন - ''এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম ! ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম। এই মাটির ঘরের জ্যোৎস্না-ওঠা দাওয়ায় সরলা বন্যবালা রাঁধিতে রাঁধিতে এমনি করিয়া ছেলেমানুষী গল্প করিত - আমি বসিয়া বসিয়া শুনিতাম। আর শুনিতাম বেশী রাত্রে ওই বনে হুড়ালের ডাক, বনমোরগের ডাক, বন্য হস্তীর বৃংহিত,হায়েনার হাসি। ভানুমতী কালো বটে, কিন্তু এমন নিটোল স্বাস্থ্যবতী মেয়ে বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। আর ওর ওই সতেজ সরল মন। দয়া আছে, মায়া আছে, স্নেহ আছে, - তার কত প্রমাণ পাইয়াছি। ...ভাবিতেও বেশ লাগে। কি সুন্দর স্বপ্ন !''[৩৫]

বেশ হত যদি সত্যচরণ ভানুমতীকে বিয়ে করে অরণ্যেই থেকে যেতেন, আরণ্যক হয়ে যেতেন। কিন্তু নগরের সাথে অরণ্যের এই নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠবার বাস্তবে যেন মোটেও সম্ভব নয়। তাই ভানুমতী-পর্ব মিষ্টি রোমান্টিক আখ্যান হয়েই তাকে। আর সত্যচরণকে নিজের ইচ্ছাকে অবদমন করে ফিরে যেতে হয় নগর-কলকাতায়। শেষ-দেখার সময় তাঁর তীব্র ইচ্ছা হল ভানুমতীর কাছ থেকে একবার শুনতে - তিনি আর এই অরণ্যে ফিরবেন না তার প্রত্যুত্তরে সে কী বলে ! সত্যচরণ নিশ্চয়ই এই অরণ্যকন্যার মুখে গভীর ভালোবাসার শব্দাবলী শুনতে

চাইছিলেন। কিন্তু তিনি তো জানেন 'ধনঝরির শৈলচূড়ায় পুষ্পিত সপ্তপর্ণের নিকট, ভানুমতীর নিকট, এই তার চিরবিদায়', তাই 'কি হইবে সরলা বনবালাকে বৃথা ভালবাসার, আদরের কথা বলিয়া ?'[৩৬] ভানুমতী তাই এক নস্টালজিক অপূর্ণ প্রেমের স্মৃতি হয়েই রইল। মানবিক প্রেম থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এবং আরো ব্যাপ্ত হয়ে সে হয়ে ঠলো অরণ্যপ্রেমের অব্যর্থ উপাদানে - ''হেমন্তের অপরাহ্নের শীতল বাতাসে পুষ্পিত বন্য সপ্তপর্ণের ঘন বনে দাঁড়াইয়া নিটোল স্বাস্থ্যবতী কিশোরী ভানুমতীর দিকে চাহিয়া মনে হইল, মূর্ত্তিমতী বনদেবীর সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি - কৃষ্ণ বনদেবী।''[৩৭] আবার এই ভানুমতীর দিকে তাকাতেই 'অলিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের' এক 'ট্র্যাজিক অধ্যায়' তাঁর চোখের সামনে ফটে ওঠে।[৩৮] এই অরণ্যচারিনী জানে না ভারতবর্ষ কোনদিকে, ভারতবর্ষের নাম পর্যন্ত কোনদিন সে শোনে নি। এ দায় তো ভানুমতীদের নয়, তথাকথিত নগরসভ্যতা এই আরণ্যক মানুষদের ভারতবর্ষের মূল আত্মার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, সেতু বাঁধারও চেষ্টা করেনি। অরণ্যকে আমরা ব্যবহার করেছি শুধু সম্পদ আহরনের খনি হিসেবে। যারা ভারতবর্ষের আদিম জনগোষ্ঠী তাদের ঠকানো হয়েছে, হয়ে চলেছে নির্মমভাবে।

'সত্যচরণের আরণ্যক ও ভানুমতীর ভারতবর্ষ' শীর্ষক রচনায় প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক সুমিতা চক্রবর্ত্তী লিখেছেন -''ভারতবর্ষ কোনদিকে ? ভানুমতীর হয়ে এই প্রশ্নটি সত্যচরণের সামনে রেখেছেন বিভূতিভূষণ। সত্যচরণের উত্তর ছিল না। আমাদেরও নেই। ভানুমতীদের জন্য সত্যচরণরা এনে দেয়নি কোনো ভারতবর্ষ। তাই পূর্ণিয়ার জঙ্গলমহালের 'অরণ্য' যখন 'আরণ্যক' হয়ে যায় তখন তা কেবল সত্যচরণদের মতো , অর্থাৎ আমাদের মতো 'শিক্ষিত','সংস্কৃত-গর্বী' ও 'প্রকৃতিপ্রেমিক'-দের কাছেই হয়,কারণ সেই ভারতবর্ষ কেবল আমাদেরই, যেখানে জেগেছিল উপনিষদের মন্ত্র। ভানুমতীর ভারতবর্ষ তার চকমকিটোলা। তার বাইরে তার জন্য ভারতবর্ষ কোন দিকে ? কয়েকটি ছোটগল্প ছাড়া এত সত্যস্পর্শী উপন্যাস বিভূতিভূষণ কি আর লিখেছেন ?''[৩৯]

এত স্পষ্ট করে অথচ শৈল্পিকভাবে অরণ্যবাসীদের প্রতি অন্যায়ের কথা বাংলা উপন্যাসে আর বলা হয়নি। 'আরণ্যক' উপন্যাসের দোবরু পান্না-ভানুমতী অধ্যায় সভ্যতাদর্পী পাঠকের দৃষ্টি খুলে দেয়। দোবরু, ভানুমতী, জগরু... এঁদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠি। এ-ও তো একজন ঔপন্যাসিকের কম বড়ো দায়বদ্ধতা নয়। আর এই অসাধারণ অধ্যায়টির সংযোজন 'আরণ্যক'কে যেমন পরিপূর্ণতা দিয়েছে, তেমনি একটি দিনলিপি বা ডায়েরীর বদলে সত্যিই

'উপন্যাস' করে তুলেছে।

আরেক অরণ্যপ্রেমিক কথাকার বুদ্ধদেব গুহ লিখেছেন - '' 'আরণ্যক' শুধু অরণ্যের দলিল নয়, আমাদের দেশের সাধারণ গরীব-গুর্বো মানুষের জীবনের একটি অসাধারণ চালচিত্রও।...বনেজঙ্গলে তো আমি কম ঘুরিনি ! বিভূতিবাবুর থেকে অনেক বেশি ঘুরেছি কিন্তু আমি তো বিভূতিবাবুর 'আরণ্যকের' মতো একটি উপন্যাস লিখতে পারবো না। ...সাহিত্যের যে উদ্দেশ্য, সৌন্দর্যবোধ জাগানো, পাঠকের মনে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা সেই প্রেক্ষিতেও 'আরণ্যকের'মতো বই বাংলা সাহিত্যে খুব কমই আছে। ...বিভূতিভূষণের অরণ্যপ্রীতি, পরিবেশ-সচেতনতা আমাদের আবিষ্ট করে এবং নির্বাক অরণ্যের সঙ্গে কিভাবে গভীর আত্মীয়তা গড়ে তুলতে হয় - তার প্রতিও ইঙ্গিত বহন করে।''[৪৩]

অরণ্যের সৌন্দর্য্য, জ্যোৎস্না, ফুল, পাখি, গাছপালা, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, নক্ষত্র,নদী, ঝর্ণা, দাবানল,কীটপতঙ্গ, ঋতুবৈচিত্র্য ইত্যাদি বর্ণনায় বিভূতিভূষণ নিখুঁত কবি-মনের পরিচয় দিয়েছেন। এই বর্ণনাগুলো 'আরণ্যক' উপন্যাসের সমগ্রতা জুড়ে নিবিড় অরণ্যের গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে। এমন কিছু বর্ণনাত্মক উদাহরণ নীচে দেওয়া হল ঃ

☐'সে জ্যোৎস্না-রাত্রির বর্ণনা নাই। কখনো সে-রকম ছায়াবিহীন জ্যোৎস্না জীবনে দেখি নাই। এখানে খুব বড় বড় গাছ নাই। ছোটখাট বনঝাউ ও কাশবন - তাহাতে তেমন ছায়া হয় না। চকচকে সাদা বালি-মিশানো জমি ও শীতের রৌদ্রে অর্দ্ধশুষ্ক কাশবনে জ্যোৎস্না পড়িয়া এমন এক অপার্থিব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা দেখিলে মনে কেমন ভয় হয়। মনে কেমন যেন একটা উদাস বাঁধনহীন মুক্তভাব - মন হু-হু করিয়া ওঠে, চারিধারে চাহিয়া সেই নীরব নিশীথরাত্রে জ্যোৎস্নাভরা আকাশতলে দাঁড়াইয়া মনে হইল এক অজানা পরীরাজ্যে আসিয়া পরিয়াছি - মানুষের কোন নিয়ম এখানে খাটিবে না। ...অমন মুক্ত আকাশ, অমন নিস্তব্ধতা, অমন নির্জনতা, অমন দিগদিগন্ত-বিসর্পিত বনানীর মধ্যেই শুধু অমনতর রূপলোক ফুটিয়া ওঠে। জীবনে একবারও সে জ্যোৎস্নারাত্রি দেখা উচিত। যে না দেখিয়াছে, ভগবানের সৃষ্টির একটি অপূর্ব রূপ তাহার নিকট অপরিচিত রহিয়া গেল।'[৪৪]

☐'জঙ্গল পার হইয়া কুন্ডীর ধারে গিয়া এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল। কুন্ডীর চারিধারে কাদার উপর আট-দশটা ছোট-বড় সাপ, অন্য দিকে তিনটি প্রকান্ড মহিষ একসঙ্গে জল খাইতেছে। সাপগুলি প্রত্যেকটি বিষাক্ত, করাত ও শঙ্খচিতি শ্রেণীর, যাহা এদেশে সাধারণত দেখা যায়।

মহিষ দেখিয়া মনে হইল এধরণের মহিষ আর কখনো দেখি নাই। প্রকান্ড এক জোড়া শিং, গায়ে লম্বা লোম - বিপুল শরীর।'[৪২]

☐'উষ্ণ বাতাস অর্দ্ধশুষ্ক কাশ-ডাঁটার গন্ধে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে, লোকালয় হইতে বহু দূরে আসিয়াছি, দিগবিদিকের জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি। কুন্ডীতে প্রায় নিঃশব্দে জল খাইতেছে একদিকে দুটি নীলগাই, অন্যদিকে দুটি হায়েনা। নীলগাইদুটি একবার হায়েনাদের দিকে চাহিতেছে, হায়েনারা একবার নীলগাইদুটির দিকে চাহিতেছে - আর দু-দলের মাঝখানে দু-তিন মাস বয়সের এক ছোট নীলগাইয়ের বাচ্চা। অমন করুণ দৃশ্য কখনও দেখি নাই - দেখিয়া পিপাসার্ত্ত বন্য জন্তুদের নিরীহ শরীরে অতর্কিতে গুলি মারিবার প্রবৃত্তি হইল না।'[৪৩]

☐'...কি অজস্র বন্য শেফালিবৃক্ষ বনের সর্বত্র, ফুলের খই ছড়াইয়া রাখিয়াছে বৃক্ষতলে, শিলাখন্ডে, ঝরণার উপলাকীর্ণ তীরে। আরও কত কি বিচিত্র বন্যপুষ্প ফুটিয়াছে, বর্ষাশেষে পুষ্পিত সপ্তপর্ণের বন, অর্জুন ও পিয়াল, নানা জাতীয় লতা ও অর্কিডের ফুল - বহুপ্রকার পুষ্পের সুগন্ধ একত্র মিলিত হইয়া মৌমাছিদের মতো মানুষকেও নেশায় মাতাল করিয়া তুলিয়াছে।'[৪৪]

☐'...সরস্বতী কুন্ডীর বন পাখীর আড্ডা। এত পাখীও আছে এখানকার বনে! কত ধরণের, কত রঙ-বেরঙের পাখী - শ্যামা, শালিক, হরট্রিট, বনটিয়া, ফেজান্ট-ক্রো, চড়াই,ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল। উঁচু গাছের মাথায় বাজবৌরী, চিল, কুল্লো - সরস্বতীর নীল জলে বক সিল্লী, রাঙা হাঁস, মানিকপাখী, কাঁক প্রভৃতি জলচর পাখী - পাখীর কাকলীতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে ঝোপের উপরটা। কি বিরক্তই করে তারা তাদের উল্লাস-ভরা অবাক কূজনে কান পাতা দায়। অনেক সময় মানুষকে গ্রাহ্যই করে না আমি শুইয়া আছি দেখিতেছি, আমার চারিপাশে হাত-দেড়-দুই দূরে তারা ঝুলন্ত ডালপালায় লতায় বসিয়া কিচ কিচ করিতেছে - আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপও নাই। পাখীদের এই অসঙ্কোচ সঞ্চরণ আমার বড় ভাল লাগিল। ...উঠিয়া বসিয়াও দেখিয়াছি তাহারা ভয় পায় না একটু হয়ত উড়িয়া গেল কিন্তু একেবারে দেশছাড়া হইয়া পালায় না। খানিক পরে নাচিতে নাচিতে বকিতে বকিতে আবার অতন্ত কাছে আসিয়া পড়ে।'[৪৫]

☐'হঠাৎ কিসের পায়ের শব্দে উঠিয়া বসিয়া মাথার শিয়রের দিকে চাহিয়া দেখি ঝোপের নিভৃততর দুর্গমতর অঞ্চলে নিবিড় লতাপাতার জড়াজড়ির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একটা ফড়িং। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি বড় হরিণ নয়, হরিণশাবক। সে আমায় দেখিতে পাইয়া অবোধ বিস্ময়ে বড় বড় চোখে আমার দিকে চাহিয়া আছে - ভাবিতেছে এ আবার কোন

অদ্ভুত জীব !'[৪৬]

☐'লবটুলিয়া ও আজমাবাদের বন্য প্রকৃতি কি মায়া-কাজল লাগাইয়া দিয়াছে আমার চোখে - শহরকে একরকম ভুলিয়া গিয়াছি। নির্জনতার মোহ, নক্ষত্রভরা উদার আকাশের মোহ আমাকে এমন পাইয়া বসিয়াছে যে, মধ্যে একবার কয়েকদিনের জন্য পাটনায় গিয়া ছটফট করিতে লাগিলাম কবে পিচঢালা বাঁধা-ধরা রাস্তার গন্ডি এড়াইয়া চলিয়া যাইব লবটুলিয়া বইহারে - পেয়ালার মত উপুড়-করা নীল আকাশের তলে মাঠের পর মাঠ, অরণ্যের পর অরণ্য, যেখানে তৈরী রাজপথ নাই, ইঁটের ঘরবাড়ী নাই, মোটর-হর্ণের আওয়াজ নাই, ঘন ঘুমের ফাঁকে যেখানে কেবল দূর অন্ধকার বনে শেয়ালের দলের প্রহর-ঘোষণা শোনা যায়, নয়তো ধাবমান নীলগাইদের দলের সম্মিলিত পদধ্বনি, নয়তো বন্য মহিষের গম্ভীর আওয়াজ।'[৪৭]

☐'...অন্ধকারাবৃত বন-প্রান্তরের উর্দ্ধাকাশে অগণ্য নক্ষত্রালোক কত দূরের বিশ্বরাজির জ্যোতির দূতরূপে পৃথিবীর মানুষের চক্ষুর সম্মুখে দেখা দিত। আকাশে নক্ষত্ররাজি জ্বলিত যেন জ্বলজ্বলে বৈদ্যুতিক বাতির মত - বাংলাদেশে অমন কৃত্তিকা, অমন সপ্তর্ষিমন্ডল দেখি নাই। দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় হইয়া গিয়াছিল। নীচে ঘন অন্ধকার, বনানী, নির্জনতা, রহস্যময়ী রাত্রি, মাথার উপরে নিত্যসঙ্গী অগণ্য জ্যোতির্লোক। এক একদিন একফালি অবাস্তব চাঁদ অন্ধকারের সমুদ্রে সুদূর বাতিঘরের আলোর মত দেখাইত। আর সেই ঘন কৃষ্ণ অন্ধকারকে আগুনের তীক্ষ্ণ তীর দিয়া সোজা কাটিয়া এদিকে ওদিকে উল্কা খসিয়া পড়িতেছে। দক্ষিণে, উত্তরে, ঈশানে, নৈর্ঋতে, পূর্বে, পশ্চিমে, সব দিকে। এই একটা, ওই একটা, ওই দুটো, এই আবার একটা - মিনিটে মিনিটে, সেকেন্ডে সেকেন্ডে।'[৪৮]

☐'যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই গাছের মাথা, ঝোপের মাথা, ঈষৎ নীলাভ শুভ্র বুনো তেউড়ির ফুল ফুটিয়া আলো করিয়া রহিয়াছে - ঠিক যেন রাশি রাশি পেঁজা নীলাভ কাপাস তূলা কে ছড়াইয়া রাখিয়াছে বনের গাছের মাথায় সর্ব্বত্র।'[৪৯]

☐'রাত্রি গভীর। একা প্রান্তর বাহিয়া আসিতেছি। জ্যোৎস্না অস্ত গিয়াছে। কোন দিকে আলো দেখা যায় না, অদ্ভুত নিস্তব্ধতা - এ যেন পৃথিবী হইতে জনহীন কোন অজানা গ্রহলোকে নিববাসিত হইয়াছি - দিগন্তরেখায় জ্বলজ্বলে বৃশ্চিকরাশি উদিত হইতেছে মাথার উপরে অন্ধকার আকাশে অগনিত দ্যুতিলোক, নিম্নে লবটুলিয়া বইহারের নিস্তব্ধ অরণ্য, ক্ষীণ

নক্ষত্রালোকে পাতলা অন্ধকারে বনঝাউয়ের শীর্ষ দেখা যাইতেছে - দূরে কোথায় শিয়ালের দল প্রহর ঘোষণা করিল - আরও দূরে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমারেখা অন্ধকারে দীর্ঘ কালো পাহাড়ের মত দেখাইতেছে - অন্য কোন শব্দ নাই কেবল এক ধরণের পতঙ্গের একঘেয়ে একটানা কি-র-র-র শব্দ ছাড়া। কান পাতিয়া ভাল করিয়া শুনিলে ঐ শব্দের সঙ্গে মিশানো আরও দু-তিনটি পতঙ্গের আওয়াজ শোনা যাইবে। কি অদ্ভুত রোমান্স এই মুক্ত জীবনে, প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ নিবিড় পরিচয়ের সে কি আনন্দ!'[৫০]

☐'মাইলের পর মাইল ব্যাপিয়া কাশ ও ঝাউবন বর্ষার জলে ভিজিতেছে, আমার আপিস-ঘরের বারান্দায় চেয়ার পাতিয়া বসিয়া দেখিতাম আমার সামনে কাশবনের মধ্যে একটা বনঝাউয়ের ডালে একটা সঙ্গীহারা ঘুঘু বসিয়া অঝোরে ভিজিতেছে, ঘন্টার পর ঘন্টাএকভাবেই বসিয়া আছে - মাঝে মাঝে পালক উসকোখুসকো করিয়া ঝুলাইয়া বৃষ্টির জল আটকাইবার চেষ্টা করে, কখনও এমনিই বসিয়া থাকে। ...এই সবুজের সমুদ্র - বর্ষাসজল হাওয়ায় মেঘকজ্জল আকাশের নীচে এই দীর্ঘ মরকতশ্যাম তৃণভূমির মাথায় ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে - আমি যেন একা এ অকূল-সমুদ্রের নাবিক - কোন রহস্যময় স্বপ্নবন্দরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়াছি।'[৫১]

☐'গ্রীষ্মকাল পড়িতে গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছের মাথায় পীরপৈতি পাহাড়ের দিক হইতে একদল বক উড়িয়া আসিয়া বসিল, দূর হইতে মনে হয় যেন বটগাছের মাথা সাদা থোকা থোকা ফুলে ভরিয়া গেছে।'[৫২]

☐'বইহারের বিস্তৃত কুলজঙ্গলের পাশ দিয়া ঘোড়ায় করিয়া ফিরিবার সময় দেখিতাম দূরে তিরাশী-চৌকার অনুচ্চ নীল পাহাড়-শ্রেণীর ওপারে শীতের সূর্য্যাস্ত। সারা পশ্চিম আকাশ অগ্নিকোণ হইতে নৈর্ঋত কোণ পর্যন্ত রাঙা হইয়া যায়, তরল আগুনের সমুদ্র, হু-হু করিয়া প্রকান্ড অগ্নিগোলকের মত বড় সূর্য্যটা নামিয়া পড়ে - মনে হয় পৃথিবীর আহ্নিক গতি যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি, বিশাল ভূপৃষ্ঠ যেন পশ্চিম দিক হইতে পূবের্ব ঘুরিয়া আসিতেছে। অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিলে দৃষ্টি-বিভ্রম উপস্থিত হইত, সত্যই মনে হইত যেন পশ্চিম দিকচক্রবাল-প্রান্তের ভূপৃষ্ঠ আমার অবস্থিতি বিন্দুর দিকে ঘুরিয়া আসিতেছে।'[৫৩]

☐'বড় চমৎকার জায়গা। একটা উপত্যকা , মুখের দিকটা বিস্তৃত, পিছনের দিকটা সংকীর্ণ - পূবের্ব পশ্চিমে পাহাড়শ্রেণী - মধ্যে এই অশ্বক্ষুরাকৃতি উপত্যকা - বন্ধুর ও জঙ্গলাকীর্ণ, ছোট বড় পাথর ছড়ানো সবর্বত্র, কাঁটা-বাঁশের বন, আরও নানা গাছপালার জঙ্গল। অনেকগুলি পাহাড়ী ঝরণা উত্তর দিক হইতে নামিয়া উপত্যকার মুক্ত প্রান্তর দিয়া বাহিরের দিকে চলিয়াছে।

এইসব ঝরণার দু-ধারে বন বড় বেশী ঘন এবং এতদিনের বসবাসের অভিজ্ঞতা হইতে জানি এইসব জায়গাতেই বাঘের ভয়। হরিণ আছে বন্য মোরগ ডাকিতে শুনিয়াছি দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে। ফেউয়ের ডাক শুনিয়াছি বটে ... পূর্ববদিকের পাহাড়ের গায়ে একটা প্রকান্ড গুহা। গুহার মুখের প্রাচীন ঝাঁপালো বটগাছ - দিনরাত শনশন করে।'[৭৪]

□'তাঁবুতে ফিরিলাম। পথে বড় একটা শিমূল গাছে ঝাঁক ঝাঁক জোনাকি জ্বলিতেছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চক্রাকারে, উপর হইতে নীচু দিকে, নীচু হইতে উপরের দিকে - নানারকম জ্যামিতির ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া আলো-আঁধারের পটভূমিতে।'[৭৫]

□'...দূরে জঙ্গলে ভয়ানক আগুন লাগিয়াছে এবং আগুন কাছারির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ...প্রচুর ধূমের সঙ্গে রাঙা অগ্নিশিখা লকলক করিয়া বহুদূর আকাশে উঠিতেছে। সেদিন আবার দারুণ পশ্চিমে বাতাস, লম্বা লম্বা ঘাস ও বন-ঝাউয়ের জঙ্গল সূর্য্যতাপে অর্দ্ধশুষ্ক হইয়া বারুদের মত হইয়া আছে, এক-এক স্ফুলিঙ্গ পড়িবামাত্র গোটা ঝাড় জ্বলিয়া উঠিতেছে - সেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় ঘন নীলবর্ণ ধূমরাশি ও অগ্নিশিখা - আর চটচট শব্দ। ঝড়ের মুখে পশ্চিম হইতে পূর্ববদিকে বাঁকা আগুনের শিখা ঠিক যেন ডাক-গাড়ীর বেগে ছুটিয়া আসিতেছে...। কি অদ্ভুত দৃশ্য! জঙ্গল ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া ছুটিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ববদিকে নীলগাইয়ের দল প্রাণভয়ে দৌড়িতেছে, শিয়াল দৌড়িতেছে, কান উঁচু করিয়া খরগোস দৌড়িতেছে, একদল বন্য শূকর তো ছানাপোনা লইয়া কাছারির উঠান দিয়াই দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছুটিয়া গেল - ও অঞ্চলের বাথান হইতে পোষা মহিষের দল ছাড়া পাইয়া প্রাণপণে ছুটিতেছে, একঝাঁক বনটিয়া মাথার উপর দিয়া সোঁ করিয়া উড়িয়া পলাইল, পিছনে পিছনে একটা বড় ছাঁক লাল হাঁস। আবার এক ঝাঁক বনটিয়া, গোটা কতক সিল্লী।'[৭৬]

□'একটা কন্টকময় গাছে বেগুনী রঙের ঝাড় ঝাড় ফুল ফুটিয়াছে, বিলাতী কর্ণফ্লাওয়ার ফুলের মত দেখিতে। একটা ফুলের বিশেষ কোন শোভা নাই, অজস্র ফুল একত্র দলবদ্ধ হইয়া অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া দেখাইতেছে ঠিক বেগুনী রঙের একখানি শাড়ির মতন। বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন অর্দ্ধশুষ্ক কাশজঙ্গলের তলায় ইহারা খানিকটা স্থানে বসন্তোৎসবে মাতিয়াছে - ইহাদের উপরে প্রবীন বিরাট বনঝাউয়ের শুষ্ক রুক্ষ অরণ্য এদের ছেলেমানুষিকে নিতান্ত অবজ্ঞা ও উপেক্ষার চোখে দেখিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রবীনতার ধৈর্য্যে তাহা সহ্য করিতেছে। সেই বেগুনী রঙের জংলী ফুলগুলি আমার কানে শুনাইয়া দিল বসন্তের আগমন বাণী। বাতাবী লেবুর ফুল নয়, ঘেঁটুফুল নয়, আম্রমুকুল নয়, কামিনীফুল নয়, রক্তপলাশ বা শিমূল

নয়, কি একটা নামগোত্রহীন রূপহীন নগন্য জংলী কাঁটাগাছের ফুল। আমার কাছে কিন্তু তাহাই কাননভরা বনভরা বসন্তের কুসুমরাজির প্রতীক হইয়া দেখা দিল।...কি গম্ভীর শোভা উঁচু ডাঙ্গার উপরকার অরণ্যের! কি ধ্যানস্তিমিত, উদাসীন, বিলাসহীন, সন্ন্যাসীর মত রুক্ষ বেস তার, অথচ কি বিরাট!'[৫]

□'গাছের নীচে ক্যাম্প-চেয়ার পাতিয়া বসিয়াছি, মাথার উপর অনেক দূর পর্যন্ত ফাঁকা আকাশ, এখনও অন্ধকার নামে নাই, দূরে নিকটে জঙ্গলের মাথায় বুনো তেউড়ির সাদা ফুল ফুটিয়া আছে রাশি রাশি, অজস্র। আমার ক্যাম্প-চেয়ারের পাশেই দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাস আধশুকনো, সোনালী রঙের। রোদ-পোড়া মাটির সোঁদা গন্ধ, শুকনো ঘাসের গন্ধ, কি একটা বনফুলের গন্ধ যেন দুর্গাপ্রতিমার রাঙতার ডাকের সাজের গন্ধের মত। মনের মধ্যে এই উন্মুক্ত, বন্যজীবন আনিয়া দিয়াছে একটা মুক্তি ও আনন্দের অনুভূতি, যাহা কোথাও কখনও আসে না এইরকম বিরাট নির্জন প্রান্তর ও জনহীন অঞ্চল ছাড়া। অভিজ্ঞতা না থাকিলে বলিয়া বোঝানো বড়ই কঠিন সে-মুক্ত জীবনের উল্লাস।'[৬]

অরণ্যের এই মুক্ত জীবনের উল্লাস একান্ত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ধন। জীবনার্জিত এই অভিজ্ঞতাকে এভাবে শিল্পরূপ দেওয়া যায় তা 'আরণ্যক' না পড়লে বোঝা দুষ্কর। উদ্ধৃত অংশগুলো প্রমাণ করে কত কাছ থেকে, কত বড় শিল্পীর মন নিয়ে বিভূতিভূষণ অরণ্যকে দেখেছেন। একদা তিনি উক্তি করেছিলেন ''I am most happy when I am in lonely primeal forest''।[৭] এই নির্জনতাকে শুধুমাত্র নিজের করে না রেখে 'আরণ্যক'-এর মধ্য দিয়ে তিনি অনুভবময় পাঠককে উদার বিস্তৃত বনপ্রান্তরের নির্জনতায় নিয়ে আসেন। পাঠক কখন নিজেই 'সত্যচরণ' হয়ে যায়। আলোচক বরুণ কুমার চক্রবর্ত্তী মন্তব্য করেছেন,''বহু বর্ণের সমারোহ 'আরণ্যক'কে দান করেছে বিরল সৌন্দর্য্য, বস্তুত দৃশ্যের পর দৃশ্যে বর্ণপ্লাবনের বিচিত্র সৌন্দর্যের ডালিকে পাঠকের কাছে উজাড় করে দেওয়া হয়েছে। সবুজ, সাদা, কালো, লাল, নীল, হলদে - কোন রঙেরই অভাব ঘটেনি। ...এত সব রঙের মধ্যে যদি কোন বিশেষ একটি রঙের প্রতি বিভূতিভূষণের দুর্বলতার কথা বলতে হয়, তবে অন্ততঃপক্ষে সর্বাধিক সংখ্যক উল্লেখের নিরিখে নীল রঙের কথাই বলতে হবে। রোমান্টিসিজমের যদি কোন রঙ আছে বলে কল্পনা করা যায় তবে তা নীল বলে মনে করলে ক্ষতি কি! বিভূতিভূষণ 'আরণ্যকে' যে প্রকৃতিকে উপস্থাপিত করেছেন তার দ্বিবিধ সত্তা - স্নিগ্ধতা তাতে যেমন বিদ্যমান, তেমনিই তার রয়েছে ভয়ঙ্করতা। ...বিভূতিভূষণ-এর প্রকৃতিপ্রেম দার্শনিকতা, আধ্যাত্মিকতায় মন্ডিত হয়ে এমন এক বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়েছে, নিরন্তর

আনন্দ ও শান্তির উৎসরূপে চিহ্নিত হয়েছে, যা অন্য কোন লেখকের রচনায় আমরা দেখি না।''[৬০] প্রকৃতি বর্ণনায় তিনি এত রঙের পাশাপাশি এনেছেন অপূর্ব সব কাব্যিক উপমা, কোথাও কোথাও যেন এই উপন্যাস এক আরণ্যক-কবিতায় পর্যবসিত হয়েছে -

☐'হাতিতে চড়ে বনের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে নিজেকে মনে হচ্ছে এক মায়ালোকের অধিবাসী - বহুদূর স্বর্গের দেবতা। কত মেঘের তলায় তলায় পৃথিবীর কত শ্যামল বনভূমির উপরকার নীল বায়ুমন্ডল ভেদ করে যেন তাঁর অদৃশ্য যাতায়াত।'[৬১]

☐আরণ্যক এক বৃদ্ধাকে দেখে সত্যচরণের মনে হচ্ছে যেন ভারতচন্দ্রের জরতী-বেশধারিনী অন্নপূর্ণার মত।[৬২]

☐সরস্বতী নদীর আওয়াজকে মনে হয় সুমিষ্ট সুরের ঠুংরী।[৬৩]

☐বসন্তের লবটুলিয়ার অরণ্যকে মনে হয় এক 'রুক্ষ কর্কশ ভৈরবী মূর্ত্তি। সৌম্য সুন্দর বটে, কিন্তু মাধুর্য্যহীন - মনকে অভিভূত করে ইহার বিশালতায়, রুক্ষতায়। কোমল-বর্জিত খাড়ব সুর, মালকোষ কিংবা চৌতালের ধ্রুপদ, মিষ্টত্বের কোন পর্দার ধার মাড়াইয়া চলে না - সুরের গম্ভীর উদাত্তরূপে মনকে অন্য এক স্তরে লইয়া পৌঁছাইয়া দেয়।'[৬৪]

☐নাঢ়া বইহারের বনকে সত্যচরণের মনে হচ্ছে 'জগতের মধ্যে একটা বিউটি স্পট।'[৬৫]

☐বনফুলের গন্ধ-এর সঙ্গে দুর্গাপ্রতিমার রাঙতার ডাকের সাজের গন্ধের মিল পাচ্ছেন সত্যচরণ।[৬৬]

☐তেউড়ি ফুলের সমারোহ দেখে মনে হচ্ছে কেউ বুঝি রাশি রাশি পেঁজা নীলাভ কাপাস তূলা বনের সবর্বত্র গাছের মাথায় ছড়িয়ে দিয়েছে।[৬৭]

☐রাতের অরণ্যকে দেখায় দীর্ঘ কালো পাহাড়ের মতো।[৬৮]

☐জোনাকীর ওড়াওড়িতে আঁকা হয়ে যায় নানান জ্যামিতিক চিত্রাবলী।[৬৯]

☐দূরের জঙ্গলের মাথায় উদীয়মান চাঁদের পটভূমিকায় আঁকাবাঁকা একটা বনঝাউয়ের ডাল দেখে মনে হচ্ছে 'ঠিক যেন জাপানী চিত্রকর হকুসাই-অঙ্কিত একখানি ছবি।'[৭০]

☐আরণ্যক সন্ধ্যা দেখে সত্যচরণের মনে হচ্ছে হিমস্নিগ্ধ বনকুসুমের সুবাস মেখে, আকাশভরা তারার মালা গলায়, কালপুরুষের আগুনের খড়গ হাতে দিগ্বিদিক আচ্ছন্ন করে এ যেন এক বিরাট কালীমূর্ত্তি।[৭১]

☐ ভানুমতী সত্যচরণের কাছে এক 'মূর্ত্তিমতী বনদেবী- কৃষ্ণ বনদেবী বলে প্রতিভাত হয়।'[৭২]

☐জ্যোৎস্নাভরা আকাশতলে নীরব নিশীথরাতে অরণ্যকে মনে হয় এক অজানা পরীরাজ্য।[১৩]

☐দুধলি ফুল ঝরে পড়ে রঙিন ফুলের গালিচা বিছিয়ে দেয়।[১৪]

☐গাছের ওপর বসে-থাকা অসংখ্য বক দেখে মনে হয় সাদা থোকা-থোকা ফুল ফুটে আছে।[১৫]

এই রকম অগণিত বর্ণনা ও কাব্যময় উপমা, তুলনা 'আরণ্যক' উপন্যাসে অরণ্যকে কবিতার সৌন্দর্য্যে নিয়ে আসে। ওয়ার্ডসওয়র্থের কবিতা পড়লে যেমন মন শুদ্ধ হয়, শান্ত হয় - তেমনি এই উপন্যাস এক অখন্ড ও নির্ভেজাল শান্তির প্রলেপ ছড়িয়ে দেয় মনের গহনে। অরণ্যের নির্মল দূষণরহিত বাতাস যেন এই পাঠের মধ্য দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে। একটি মুহূর্ত্তের জন্যও অরণ্য-অন্তর্ভূত ঘ্রাণ থেকে আমাদের সরে আসতে দেন না ঔপন্যাসিক। অরণ্য-সংরক্ষণের প্রচারমুখী কোনো বাড়তি কথা তাঁকে বলতে হয় না। পাঠক কখন অজান্তেই সামগ্রিকভাবে অরণ্যের প্রেমে হাবুডুবু খান।

লেখকপুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন - ''ভাগলপুরের আজমাবাদ, লবটুলিয়া, ইসমাইলপুর, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের প্রান্তসীমা - এই বিস্তৃত অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত অরণ্যই 'আরণ্যক'-এর পটভূমি। অন্য যে কোনো উপন্যাস থেকে 'আরণ্যক' কেন পৃথক তার কারণও এখানে নিহিত। প্রকৃতি সাধারণতঃ কাহিনীর পটভূমি হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। এখানেও সেইভাবেই শুরু। কিন্তু কখন যে লেখনীর আশ্চর্য্য জাদুস্পর্শে পটভূমি স্বয়ং একটি প্রধান চরিত্রে পরিণত হয়েছে, পড়তে পড়তে তা বোঝা যায় না। হঠাৎ একসময় উপলব্ধি ঘটে, সচমকে পাঠক আবিষ্কার করেন - পটভূমি নিজেই মঞ্চে নেমে এসেছে।''[১৬]

অরণ্য যে এইভাবে চরিত্রে রূপান্তরিত হয় - তার জন্য বিভূতিভূষণকে সমগ্র অরণ্যকে চিনতে হয়েছে। অরণ্যের রীতি, সংস্কার, কুসংস্কার ইত্যাদিকে পরম বিশ্বাসযোগ্যতায় তুলে এনেছেন। অরণ্যের একটা বৈশিষ্ট তার রহস্যময়তা। আরণ্যক মানুষদের অশিক্ষা, অজ্ঞতা, নাগরিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রা এবং সরল বিশ্বাস তাদের মধ্যে বহু কুসংস্কারের জন্ম দেয়, তৈরী হয় নানা আরণ্যক রীতি-নীতি। এগুলো বাদ গেলে অরণ্য অনেকটাই অচেনা থেকে যায়। 'আরণ্যক'-এ এমন অনেক খন্ড খন্ড আরণ্যক বিশ্বাস রয়েছে, বিভূতিভূষণের মুন্সিয়ানা এখানেই যে সেসব পড়তে পড়তে কখনো অবিশ্বাস হয় না, মনে আমরাও হয়ে যাই বিশ্বাসী অরণ্যের বাসিন্দা ঃ

□'বোমাইবুরু-র জঙ্গলের আমীন রামচন্দ্র সিং-এর জংলী কুটীরে রোজই এক সাদা কুকুর ঢোকে। কিন্তু আসরফি টিন্ডেল গিয়ে দেখে একটি মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে অরণ্যের গভীরে চলে গেল। সকালে খাটের নীচটা খুঁজে সে একগোছা কালো রমণীর চুল পেল। অথচ কাছাকাছি কোনো মেয়ে নেই। - সত্যচরণের একথা প্রাথমিক বিশ্বাস না হলেও আট মাস পর আবার এক আরণ্যক বৃদ্ধের মুখে শুনলেন তার ছেলের ঘর থেকে রাতে প্রায়ই এক মেয়েমানুষকে বেরোতে দেখেন, অথচ ছেলেটি মেয়েটির খবর জানে না। সে দেখে তার ঘর থেকে একটা কুকুর বেরিয়ে যাচ্ছে। তারপর জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল একটি নারী পিছনের জঙ্গলের দিকে চলে গেল। এই অশরীরী মেয়ের পিছনে ধাওয়া করেই একদিন যুবকটি নিহত হল। সত্যচরণ নিজে গিয়ে দেখলেন - যে ঘরটাতে সে থাকত তারই পিছনে কাশ ও বনঝাউ জঙ্গলে ছেলেটির মৃতদেহ ত খনও পড়ে আছে, মুখে তার ভীষণ ভয় ও আতঙ্কের চিহ্ন - কি একটা বিভীষিকা দেখে আটকে যেন সে মারা গেছে।''

□বুনো মহিষের দলের দেবতা হলেন টাঁড়বারো। চোরাশিকারীদের হাত থেকে তিনি বন্য মোষদের রক্ষা করেন। সত্যচরণ এমন বিশ্বাসের কথা শুনেছেন গনু মাহাতো এবং বনেরইজারাদার দশরথ সিং ঝান্ডাওয়ালার কাছে। বনের আমলাদের ঘুষ খাইয়ে একবার দশরথ ও ছোটু সিং বুনো মোষ শিকারের পারমিট বের করলেন। গভীর রাতে যে পথ দিয়ে বন্য মোষের দল যায় জল খাবার জন্য, সেই পথের মধ্যে গভীর খানা কেটে তার ওপর বাঁশ ও মাটি বিছিয়ে তারা ফাঁদ তৈরী করলেন। উদ্দেশ্য রাতে মোষের দল চলতে গিয়ে ওই গর্তেপড়ে যাবে। জঙ্গল-অভিজ্ঞ এক সাঁওতাল বৃদ্ধ তাদের বললেন - এভাবে মোষ ধরা অসম্ভব। কারণ তাদের দেবতা টাঁড়বারো অবশ্যই বিপদ থেকে বুনো জন্তুদের বাঁচাবেন। দশরথ সিং তার অভিজ্ঞতার কথা সত্যচরণের কাছে এভাবে ব্যক্ত করছেন - ''এখনও ভাবলে আমার গা কাঁটা দেয়। গহিন রাতে আমরা নিকটেই একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি, বুনো মহিষের দলের পায়ের শব্দ শুনলাম, তারা এদিকে আসছে। ক্রমে তারা খুব কাছে এল, গর্ত্ত থেকে পঞ্চাশ হাতের মধ্যে। হঠাৎ দেখি গর্ত্তের ধারে, গর্ত্তের দহ হাত দূরে এক দীঘাকৃতি কালো মত পুরুষ নিঃশব্দে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে, এত লম্বা সে মূর্ত্তি, যেন মনে হল বাঁশঝাড়ের আগায় ঠেকেছে। বুনো মহিষের দল তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, তারপরে ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক-ওদিক পালাল, ফাঁদের ত্রিসীমানাতে এল না একটাও। বিশ্বাস করুন আর না করুন, নিজের চোখে দেখা।'' আরণ্যক পরিমন্ডলে এমনভাবে বলা হয়েছে যে যুক্তিবাদী সত্যচরণ ও তখন অবিশ্বাস করতে পারেননি। এই

অশ্রুতপূর্ব বনদেবতার কথা শুনে তিনিও মনে মনে শিহরিত হতেন।[১৮]

□রাজু পাঁড়ে ও বন্য গাঙ্গোতার দল বিশ্বাস করেন না পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। তাদের বিশ্বাস সূর্যই আসলে চলাচল করছে। রাজু পাঁড়ে অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন য়-পাহাড়ের এক গুহা থেকে রোজ সূর্য ওঠে - যে গুহা মুঙ্গেরের এক সাধু দেখেও এসেছেন এবং সেই গুহা থেকে ঐ সাধু চকচকে অস্ত্রের কুচি নিয়ে এসেছিলেন। দিনশেষে সূর্য একটি সাগরে নেমে যায়। তাদের কাছে সূর্য একটি বস্তু নয়, একটি জীবন্ত সত্তা। তাই সুর্য হয়ে গেছে'সূরযনারায়ণ'। এদের অকাট্য বিশ্বাস দেখে নাগরিক সত্যচরণ ভাবছেন - 'হায় গ্যালিলিও,এই নাস্তিক বিচারমূঢ় পৃথিবীতেই তুমি কারারুদ্ধ হইয়াছিলে।'[১৯]

□''এই দেশের রীতিই নাকি এইরূপ - গ্রামের মেয়ে বা কোনও প্রবাসিনী সখী, কুটুম্বিনী বা আত্মীয়ার সঙ্গে দেখা হইলেই উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া মড়াকান্না জুড়িয়া দিবে। অনভিজ্ঞ লোকে ভাবিতে পারে উহাদের কেহ মরিয়া গিয়াছে, আসলে ইহা আদর আপ্যায়নের একটা অঙ্গ। না কাঁদিলে নিন্দা হইবে।''[২০]

আরণ্যক বিশ্বাস কুসংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে অরণ্যসাহিত্যে বিভূতিভূষণের যোগ্যতম উত্তরসূরী বুদ্ধদেব গুহ তাই বলেছেন - ''এইসব কথা এইসব ঘটনা শহরের পাঠকদের কাছে অত্যন্ত হাস্যকর বলে মনে হবে। কিন্তু বিভূতিবাবু নিজে জঙ্গলে ছিলেন, কিছুদিন হলেও ছিলেন। আমি তার চেয়ে অনেক বেশি দিন বিভিন্ন জঙ্গলে থেকেছি। বারবার থেকেছি গত চল্লিশ বছরে। এই শহরে বসে এই আলো-জ্বলা, এই এয়ার-কন্ডিশনার-চলা, এই মেট্রো-রেলের শহরে বসে ধারণা করা সম্ভব নয় আমাদের দেশের নববই ভাগ মানুষ এখনো কি পরিবেশে বাস করে এবং প্রকৃতির কি প্রভাব তাদের উপরে। এবং ঐ রকম অবস্থায়, ঐ রকম জঙ্গলে, ঐ রকম অবস্থানে, ঐ রকম পরিবেশে, প্রতিবেশে, ঐ রকম প্রেক্ষিতে যদি আপনারা কেউ গিয়ে থাকেন দীর্ঘদিন তাহলেই জানবেন যে, মনের মধ্যে এই রকম অনেক কিছু আধিভৌতিক অভিঘাত হওয়াটা আশ্চর্য কিছুই নয়।- আমি বলছি না যে ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করি। আমি দেখিনি নিজে কখনো কিন্তু সেই জঙ্গলের মানুষেরা যারা দেখেছে বলে বিশ্বাস করে এবং তাদের উপরে বসন্তের পাখির গান শীতের রুক্ষ প্রকৃতি এবং বর্ষার মেঘের বাদল যেমন প্রভাব বিস্তার করে অথবা বনের বড় বাঘ অথবা সাপ বা অন্যান্য হাজারো প্রাণী। তেমনি এইসব আধিভৌতিক ঘটনাও করে। চাঁদনি রাতে জিন পরিরা খেলে বেড়ায়, বিভূতিভূষণ লিখেসছন আরণ্যকে। গভীর জলের নীচে জঙ্গলের মধ্যে প্রকান্ড বড় হ্রদ, সরস্বতী কুন্ডী, যার ধারে যুগলপ্রসাদ নানা

ফুল গাছ লাগিয়ে আনন্দ পায়, এই তার ঈশ্বরের পুজোর রকম। সেই হ্রদে জ্যোৎস্না রাতে জিন পরিরা জলকেলি করে, এসব বিশ্বাস এই জঙ্গলের মানুষদের আছে। - শহরের জ্ঞান নিয়ে গিয়ে তাদের সেই বিশ্বাসে ফাটল ধরানো ভারী মুস্কিল। তাছাড়া ফুটল ধরানোর দরকারই বা কি?...আমাদের শিক্ষিত, তথাকথিত শিক্ষিত শহুরে মানুষদের বিদ্যা, বুদ্ধি কিংবা শুভবোধ জোর করে তাদের উপর প্রয়োগ করতে গিয়ে তাদের নষ্ট করার কোন অধিকার কি আমাদের আছে ?''[৮১]

বিভূতিভূষণ কখনোই সত্যচরণের মধ্য দিয়ে নাগরিক যুক্তি, জ্ঞান, বিদ্যা ইত্যাদি অরণ্যচারী মানুষদের মধ্যে আরোপ করতে চাননি। রাজু পাঁড়ে-কে জোর করে বোঝাতে চাননি মহাকাশের আসল গ্রহতত্ত্ব। ভানুমতী যখন বুনো দেবতা 'টাঁড়বারোর গাছ' তাঁকে চিনিয়ে দিচ্ছে - টাঁড়বারোর অনস্তিত্ব নিয়ে একটা কথাও না বলে তিনি যেন অপার সম্ভ্রমই প্রকাশ করেছেন এই কাল্পনিক বনদেবতার প্রতি। জঙ্গলমহালের কাছারিতে আসা এবং বনের কোলে মিলিত-হওয়া মানুষদের কাছ থেকে তিনি অরণ্যের অসংখ্য অভিজ্ঞতার গল্প শুনেছেন। কিন্তু কখনোই তাঁর নাগরিক-মতামত তার সঙ্গে জুড়ে দিতে চাননি।

আরণ্যক-সংস্কৃতিকেও বিভূতিভূষণ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। লোকায়ত শিল্পের প্রতি অগাধ মমত্ব ফুটে উঠেছে। অরণ্যবাসী মানুষজনের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা 'আরণ্যক'-এর পাতায় পাতায় রয়েছে, তেমনি তাদের শিল্পের প্রতি সত্যচরণের টান প্রকাশ পেয়েছে নানান ঘটনায় ঃ-

□খান উৎপাদন না হওয়ায় একদল মানুষ দেশে দেশে নাচ দেখিয়ে উপার্জন করতে বেরোয়। জঙ্গলমহালের কাছারিতেও ঢোল বাজাতে বাজাতে তেমন একটি নাচের দল একদিন উপস্থিত হল। এর নাম 'হো হো নাচ আর হুক্করবাজি নাচ'। সত্যচরণের এই নাচ দেখার অনুভূতি এরকম - ''অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহারা নাচিল ও গান গাহিল। বেলা পড়িবার সময় তাহারা আসিয়াছিল, ক্রমে আকাশে জ্যোৎস্না ফুটিল, তখনও তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাত ধরিয়া নাচিতেছে ও গান গাহিতেছে। অদ্ভুত ধরণের নাচ ও সম্পূর্ণ অপরিচিত সুরের গান।এই মুক্ত প্রকৃতির বিশাল প্রসার ও এই সভ্য জগৎ হইতে বহুদূরে অবস্থিত নিভৃত বন্য আবেষ্টনীর মধ্যে এই দিগন্তপরিপ্লাবী ছায়াবিহীন জ্যোৎস্নালোকে এই নাচ-গানই চমৎকার খাপ খায়।'' ক্ষুধাপীড়িত একটি বন্য নৃত্যদলের মধ্য দিয়ে লোকশিল্পীদের প্রতি নগরসভ্যতার বঞ্চনা নির্মমভাবে ফুটে ওঠে। সতেরো-আঠারো জনের একটি শিল্পীদলের

দক্ষিণা মোটে চার আনা। জনহীন প্রান্তর ও বন পার হয়ে দূরে দূরান্তরে এই লোকশিল্পীরা জীবনের তাগিদে ছুটে চলেছেন। তাদের প্রতি অবমাননা ও তাদের দুঃখ-কষ্ট সত্যচরণকে পীড়িত করে। দলের সর্দারকে তিনি যখন দুটো টাকা দেন - সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।[৮২]

□অনশনক্লিষ্ট কিশোরশিল্পী ধাতুরিয়া 'আরণ্যক'-এর এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তার বর্ণনা এভাবে দেওয়া আছে - ''ছেলেটির চেহারা যাত্রাদলের কৃষ্ণঠাকুরের মত। এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ভারি শান্ত, সুন্দর চোখ-মুখ, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। দলের সামনে দাঁড়াইয়া সে-ই প্রথমে সুর ধরে ও পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া নাচে যখন - ঠোঁটের কোণে হাসি মিলাইয়া থাকে।...শুধু দুটি খাইবার জন্য ছেলেটি দলের সঙ্গে ঘুরিতেছে। পয়সার ভাগ সে বড় একটা পায় না। তাও সে খাওয়া কি ! চীনা ঘাসের দানা, আর নুন। বড়জোর তার সঙ্গে একটু তরকারি - আলুপটল নয়, জংলী গুড়মি ফল ভাজা, নয়ত বাথুয়া শাক সিদ্ধ, কিংবা ধুঁধুল ভাজা। এই খাইয়াই মুখে হাসি সর্বদা লাগিয়া আছে। দিব্যি স্বাস্থ্য, অপূর্ব লাবণ্য সারা অঙ্গে।''[৮৩] এত দারিদ্রের মধ্যে থেকেও এই বুনো কিশোরের মধ্যে ভালো ভালো নাচ শেখার কত আকুলতা। পূর্ণিয়ার হো-হো নাচের সঙ্গে ধরমপুর অঞ্চলের নাচের কী পার্থক্য, ছক্করবাজি নাচের সঙ্গে বালিয়া জেলার ছট পরবের মেয়েদের নাচের সঙ্গে কোথায় মিল -এই নিয়ে তার শৈল্পিক অনুসন্ধিৎসা। জঙ্গলমহালের কাছারির প্রাঙ্গনে সে চমৎকার নেচে দেখায় 'ননীচোর নাটুয়ার' নাচ। সত্যচরণ এই আরণ্যক- শিল্পীকে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিলেন কিছুটা জমির বন্দোবস্ত করে দিয়ে। কিন্তু ধাতুরিয়া-র মধ্যে উদাসীন এক শিল্পীসত্তা - ''কিন্তু চাষ-কাজ কি আমায় দিয়ে হবে ? ওদিকে আমার মন নেই যে ! নাচদেখাতে পেলে আমার মনটা ভারী খুশী থাকে। আর কিছু তেমন ভালো লাগে না।''[৮৪] সে জানত কলকাতায় নাচের কদর আছে। তাই সত্যচরণের কাছে আবেদন জানায় কলকাতায় নিয়ে যাবার। সত্যচরণ এ আবেদনে সাড়া দেননি। তিনি হয়তো উপলব্ধি করেছিলেন -ধাতুরিয়ার নির্মল আরণ্যক সরল শিল্পীসত্তা কলকাতার নাগরিক ভীড়ে হারিয়ে যাবে, যোগ্য মর্যাদা পাবে না। এই ধাতুরিয়া কাটারিয়া স্টেশনের কাছে রেলে কাটা পড়ে মারা যায়। হয়তো অভিমানেই। তাকে আর কেউ প্রকৃত চেনেনি, সত্যচরণ ছাড়া। সত্যচরণের মুখ দিয়ে বিভূতিভূষণ হয়তো নিজের মনের কথাই বলেছেন - ''সেই বন্য অঞ্চলে দু-বছর কাটাইবার সময় যতগুলি নরনারীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম - তার মধ্যে ধাতুরিয়া ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাহার মধ্যে যে একটি নির্লোভ, সদাচঞ্চল, সদানন্দ, অবৈষয়িক, খাঁটি শিল্পীমনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, শুধু সে বন্য দেশ কেন, সভ্য অঞ্চলের

মানুষের মধ্যেও তা সুলভ নয়!''[৮৫]

□অরণ্যের কোলে রাজা দোবরু পান্নার রাজত্বে আরণ্যক ঝুলনোৎসব - তার নৃত্য, গীত সত্যচরণ ও তার সঙ্গী রাজু পাঁড়ে ও মুনেশ্বর সিং-কে মুগ্ধ করেছিল। ধনঝরি শৈলমালার পাদদেশে তাদের এই উৎসব। একটা প্রাচীন পিয়াল গাছের গুঁড়ি ফুল ও লতা দিয়ে জড়ানো হয়েছে। তারই নীচে আরণ্যক আদিবাসী সুরে মেয়েরা গান গায়, নাচে। সত্যচরণ বন্য জীবনের সঙ্গে একীভূত হয়ে উপভোগ করেন - ''...এই পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনস্থলীতে প্রায় ত্রিশটি কিশোরী তরুণী গাছটিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল - পাশে পাশে মাদল বাজাইয়া একদল যুবক তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। ভানুমতী দেখিলাম এই দলের পুরোভাগে। মেয়েদের খোঁপায় ফুলের মালা, গায়ে ফুলের গহনা।... কত রাত পর্যন্ত সমান ভাবে নাচ ও গান চলিল - মাঝে মাঝে দলটি একটু বিশ্রাম করিয়া লয় আবার আরম্ভ করে - মাদলের বোল, জ্যোৎস্না, বর্ষাস্নিগ্ধ বনভূমি, সুঠাম শ্যামা নৃত্যপরায়না তরুণীর দল - সব মিলিয়া কোন বড় শিল্পীর অঙ্কিত একখানি ছবির মত তা সুশ্রী - একটি মধুর সঙ্গীতের মত তার আকুল আবেদন।''এই অরণ্যের কোলে চন্দ্রালোকিত রাতে বসে অরণ্যবালাদের নাচ-গানে ডুবতে ডুবতে সত্যচরণ ইতিহাস এবং ইতিহাস-অতীত কোন যুগে যেন চলে যান।চাঁদ পশ্চিম দিকের দূর বনের পিছনে ঢলে পড়া পর্যন্ত এ নাচগান চলল।''[৮৬]

আরণ্যক এই সংস্কৃতির ছোঁয়া এই উপন্যাসে একটা অপূর্ব গীতিময়তা এনে দিয়েছে। 'আরণ্যক'-এর আরেকটি সম্পদ তার এই গুণ।

অরণ্যপ্রীতি ও মানবপ্রীতি এই উপন্যাসে মিলেমিশে একাকার। বিভিন্ন ধরণের অসংখ্য মানুষ এখানে সম্মিলিত হয়ে অরণ্যের আসল চেহারাটাকে তুলে ধরেছে। এদের যেমন অরণ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না, তেমনি অরণ্যকেও এদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। চীনা ঘাসের দানা, লাল পিঁপড়ের ডিম শুকনো কুল, বুনো শিম, শুঁটকী, জংলী গুড়মি ফল কিংবা ধুঁধুল ভাজা আর বাখুয়া শাক সিদ্ধ খেয়ে বেঁচে থাকা মানুষগুলো সরল হলেও আরণ্যক গাছেদের মতোই ঋজু, কষ্টসহা। অরণ্য ও প্রকৃতিকে ভালোবাসবার কথা এ উপন্যাসে যেভাবে বলা হয়েছে তার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। চাকরীর দায়িত্ব মেনে সত্যচরণকে জঙ্গল কেটে বসতি গড়বার অনুমতি দিতে হয়েছে, আর চোখের সামনে অরণ্যনিধন দেখে তিনি নিজেকে অপরাধী ভেবেছেন। অন্তর্বেদনায় সত্যচরণ নীল হয়ে গেছেন। বারবার সেজন্য তিনি নিজের দোষ স্বীকার করেছেন। আমরা জানি একজন কর্মচারী হিসেবে এক্ষেত্রে তাঁর কোনো দায় ছিল না। কিন্তু সত্যচরণ অরণ্যধ্বংসের অপরাধের ভার নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছে। এখানে

বিভূতিভূষণ নগর-সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে সত্যচরণকে হাজির করিয়েছেন। তাঁর শোক-এর মধ্য দিয়ে তিনি নগর-মানুষকে অরণ্য-প্রেমের কথা শোনাতে এবং বোঝাতে চেয়েছেন - ''...মন খারাপ হইয়া গেল যখন বেশ বুঝিলাম নাঢ়া বইহারের এ বন আর বেশী দিন নয়। এত ভালবাসি ইহাকে অথচ আমার হাতেই ইহা বিনষ্ট হইল। দু-বৎসরের মধ্যেই সমস্ত মহালটি প্রজাবিলি হইয়া কুর্মী টোলা ও নোংরা বস্তিতে ছাইয়া ফেলিল বলিয়া। প্রকৃতির নিজের হাতে সাজানো তার শত বৎসরের সাধনার ফল এই নাঢ়া-বইহার, ইহার অতুলনীয় বন্য সৌন্দর্য্য ও দূরবিসর্পী প্রান্তর লইয়া বেমালুম অন্তর্হিত হইবে। অথচ কি পাওয়া যাইবে তার বদলে ? কতকগুলি খোলার চালের বিশ্রী ঘর, গোয়াল, মকাই-জনারের ক্ষেত, শোনের গাদা, দড়ির চারপাই, হনুমানজীর ধবজা, ফণিমনসার গাছ, যথেষ্ট দোক্তা, যথেষ্ট খৈনী, যথেষ্ট কলেরা ও বসন্তের মড়ক।... হে অরণ্য, হে সুপ্রাচীন, আমায় ক্ষমা করিও।''[৮৫]

এত সত্য, অথচ নির্মমভাবে অরণ্যধ্বংসের পরিণাম সম্পর্কে আর কোথায় বলা হয়েছে ? সত্যচরণ উপলব্ধি করেছেন অরণ্যনিধন কখনোই সভ্যতার সহায়ক হতে পারে না, বরঞ্চ তা সভ্যতার পরিপন্থী। সবুজ বনানী গভীর দান ও অপার সৌন্দর্য্যে সভ্যতারই চিরন্তন সঙ্গীত গায়, তাকে হত্যা করলে সভ্যতারই বিপদ।

আদি অকৃত্রিম অরণ্যের কাছে সত্যচরণ শুধু একবার ক্ষমা চাননি। তাঁর অপরাধের স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়েই উপন্যাসের শুরু। ক্রমান্বয়ে অরণ্যের প্রেমে মগ্ন হয়ে যাওয়া এবং অরণ্যধ্বংসের জন্য সীমাহীন অনুতাপ। চতুর্দ্দশ পর্বে সুপ্রাচীন অরণ্যের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছেন এবং উপন্যাস যখন শেষ হচ্ছে, সত্যচরণ অরণ্য থেকে শহরে ফিরে আসছেন তখন আবারো তিনি অকপটে ক্ষমা চাইলেন। নাঢ়া বইহারের সীমানা পার হয়ে পালকি থেকে মুখ বাড়িয়ে তিনি একবার পিছন ফিরে চেয়ে দেখলেন - দিগন্তলীল মহালিখারূপের পাহাড় ও মোহনপুরা অরণ্যানীর উদ্দেশ্যে দূর থেকে নমস্কার করলেন। বললেন - ''হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়। বিদায়।''[৮৬]

তিনি নগরে ফিরে এলেন, কিন্তু অরণ্যের সঙ্গে তাঁর অন্তরের বিচ্ছেদ কিন্তু হল না। **William Wordaworth**-এর মতোই পেছনের সবুজ-ঘেরা স্মৃতিগুলো তাঁর চিরদিনের সম্পদ হয়ে রইল। আমরা জানি, এ সত্যচরণের সম্পদ নয়, আসলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নিজেরই শাশ্বত সম্পদ। 'আরণ্যক' তার যাদুমন্ত্রে সকল নগর-পাঠককেই সত্যচরণ বানিয়ে ফেলে। এই রূপান্তর যদি সর্বব্যাপি হোত তাহলে বহু অরণ্য নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে

যেতো। 'আরণ্যক' একটি প্রচার-গ্রন্থ না হয়েও তার আবেদন এত প্রাঞ্জল, সর্বব্যাপী, এবং অর্থবাহী। সবশেষে 'আরণ্যক' নিয়ে বিভূতিভূষণ-পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিশ্লেষণ উদ্ধৃত করা যাক -

'' 'আরণ্যক'-এর রঙ্গমঞ্চ নেহাৎ সঙ্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ ভূখন্ড নয় - প্রায় আট-দশ হাজার বিঘা জুড়ে তার বিস্তৃতি। যেমন সুবিস্তৃত তার আয়তন তেমনি অসাধারণ বৈচিত্র্যমন্ডিত তার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী। কোথাও উন্মুক্ত প্রান্তর ও তৃণভূমি, কোথাও কাশবন ও ঝাউবন, কোথাওবা শুধু ছড়ানো ছিটানো ঝোপঝাড়, বনফুল ও কেঁয়োঝাঁকার জঙ্গল। একদিকে সরস্বতী কুন্ডীর তীরভূমিস্থ স্বপ্নসৌন্দর্য্যের মায়াকানন, অন্যত্র নানা বন্যজন্তু-অধ্যুষিত বৃক্ষচ্ছায়াশূণ্য লতাজালজটিল ঘনসন্নিবিষ্ট অরণ্যানী। আছে হ্রদ, নদী, টিলা,পাহাড়, চারণভূমি, মকাই বা চীনাদানার ছোট ছোট ক্ষেত, আর আছে বন কেটে আবাদ করা জমির উপর ক্রোশের পর ক্রোশ বিছানো হলুদ-রঙা সর্ষেফুলের সুবর্ণ গালিচা। এছাড়া আরও আছে ঋতুরঙ্গশালায় একের পর এক পটপরিবর্তণ, পৃথিবীর বার্ষিক গতির সঙ্গে তাল বজায় রেখে লতা-পাতা-পুষ্প-পল্লবের রঙ-বদলের সমারোহ - অপরূপ রূপবৈচিত্র্যের যেন আর অন্ত নেই।''[১৯]

উল্লেখপঞ্জী

১) বিভূতিভূষণ:জীবন ও সাহিত্য,সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, সাহিত্যায়ন, ১/১ বি ডাঃ অমল রায়চৌধুরী লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-২৭-২৮

২) তদেব, পৃষ্ঠা-৩০

৩) তদেব, পৃষ্ঠা-৩১

৪) স্মৃতির রেখা, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৬৮, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২, পৃষ্ঠা-১৭

৫) তদেব, পৃষ্ঠা-১০৭-১০৮

৬) অপ্রকাশিত দিনলিপি, ২২.২.১৯৩৪-এ লেখা, বিভূতিভূষণ:জীবন ও সাহিত্য,সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, সাহিত্যায়ন, ১/১ বি ডাঃ অমল রায়চৌধুরী লেন, কলকাতা-৭০০০০৯,

৭) তদেব

৮) কিশলয় ঠাকুর, জীবনের জলছবি, আরণ্যকের অনন্যতা, তাপস বসু সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-১০-১১

৯) আরণ্যকের অনন্যতা, তাপস বসু সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-১৮১

১০) বিভূতিভূষণ:জীবন ও সাহিত্য,সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, সাহিত্যায়ন, ১/১ বি ডাঃ অমল রায়চৌধুরী লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-৩৪৬-৩৫৯

১১) তদেব, পৃষ্ঠা-১৩৮

১২) আরণ্যক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৮৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২,ভূমিকা

১৩) বন্দিতা ভট্টাচার্য্য, আরণ্যক ঃ কাহিনীর মগ্নতায়, আরণ্যকের অনন্যতা, তাপস বসু সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-৪৯

১৪) আরণ্যক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৮৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২, পৃষ্ঠা-৩

১৫) তদেব, পৃষ্ঠা-৩-৪

১৬) তদেব, পৃষ্ঠা-৪

১৭) তদেব, পৃষ্ঠা-৭

১৮) তদেব, পৃষ্ঠা-৮

১৯) তদেব, পৃষ্ঠা-১০

২০) তদেব, পৃষ্ঠা-১৪

২১) তদেব, পৃষ্ঠা-১৩

২২) তদেব, পৃষ্ঠা-১৭

২৩) তদেব, পৃষ্ঠা-৭১

২৪) তদেব, পরিশিষ্ট-গ, পৃষ্ঠা-২১

২৫) তদেব, পৃষ্ঠা-৭০-৭১

২৬) তদেব, পৃষ্ঠা-২৮

২৭) তদেব, পৃষ্ঠা-২৯

২৮) তদেব, পৃষ্ঠা-৪৮

২৯) তদেব, পৃষ্ঠা-১৩-১৪

৩০) বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০০, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা-২৭০

৩১) আরণ্যক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৮৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২, পৃষ্ঠা-১০১-১০২

৩২) তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আরণ্যকের পটভূমি এবং নারীচরিত্র, আরণ্যকের অনন্যতা, তাপস বসু সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-১৮২

৩৩) আরণ্যক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৮৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২, পৃষ্ঠা-১১৬

৩৪) তদেব, পৃষ্ঠা-১১৯

৩৫) তদেব, পৃষ্ঠা-১৬০

৩৬) তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৭

৩৭) তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৬

৩৮) তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৬

৩৯) আরণ্যকের অনন্যতা, তাপস বসু সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-১৯৪

৪০) তদেব, পৃষ্ঠা-২২৪,২২৫, ২২৬, ২২৮

৪১) আরণ্যক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৮৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২, পৃষ্ঠা-১৫

৪২) তদেব, পৃষ্ঠা-২৩

৪৩) তদেব, পৃষ্ঠা-২৪

৪৪) তদেব, পৃষ্ঠা-৫২

৪৫) তদেব, পৃষ্ঠা-৬৭

৪৬) তদেব, পৃষ্ঠা-৬৮

৪৭) তদেব, পৃষ্ঠা-৭২-৭৩

৪৮) তদেব, পৃষ্ঠা-৮১-৮২

৪৯) তদেব, পৃষ্ঠা-৯৪

৫০) তদেব, পৃষ্ঠা-১০৬

৫১) তদেব, পৃষ্ঠা-১৩৩

৫২) আরণ্যক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৮৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২, পৃষ্ঠা-১৮

৫৩) তদেব, পৃষ্ঠা-৮১

৫৪) তদেব, পৃষ্ঠা-১০৭

৫৫) তদেব, পৃষ্ঠা-১০৯

৫৬) তদেব, পৃষ্ঠা-২৫-২৬

৫৭) তদেব, পৃষ্ঠা-৫৫

৫৮) তদেব, পৃষ্ঠা-৯৫

৫৯) আরণ্যকের অনন্যতা, তাপস বসু সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-১৩৯

৬০) আরণ্যক ঃ প্রকৃতির তন্ময়তায়, বরুণ কুমার চক্রবর্ত্তী, আরণ্যকের অনন্যতা, তাপস বসু সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-১৪৭,১৪৮,১৫০

৬১) আরণ্যক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৮৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২, পৃষ্ঠা-৬১

৬২) তদেব, পৃষ্ঠা-৫৩

৬৩) তদেব, পৃষ্ঠা-৬৭

৬৪) তদেব, পৃষ্ঠা-৬৭

৬৫) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৭

৬৬) তদেব, পৃষ্ঠা-৯৫

৬৭) তদেব, পৃষ্ঠা-৯৪

৬৮) তদেব, পৃষ্ঠা-১০৬

৬৯) তদেব, পৃষ্ঠা-১০৯

৭০) তদেব, পৃষ্ঠা-৮

৭১) তদেব, পৃষ্ঠা-১৪

৭২) তদেব, পৃষ্ঠা-১৪

৭৩) তদেব, পৃষ্ঠা-১৫

৭৪) তদেব, পৃষ্ঠা-১৫

৭৫) তদেব, পৃষ্ঠা-১৮

৭৬) আরণ্যক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৮৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২, পরিশিষ্ট-ক, পৃষ্ঠা-৪

৭৭) তদেব, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পর্ব-১

৭৮) তদেব, নবম পরিচ্ছেদ, পর্ব-৫

৭৯) তদেব, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, পর্ব-৫

৮০) তদেব, পৃষ্ঠা-৩৭

৮১) আরণ্যকের অনন্যতা, তাপস বসু সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-২২৮

৮২) আরণ্যক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৮৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২,পঞ্চম পরিচ্ছেদ, পর্ব-৪

৮৩) তদেব, পৃষ্ঠা-৪১

৮৪) তদেব, পৃষ্ঠা-১৩৫

৮৫) তদেব, পৃষ্ঠা-১৩৬

৮৬) তদেব, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, পর্ব-৩

৮৭) তদেব, পৃষ্ঠা-১২৫-১২৬

৮৮) তদেব, পৃষ্ঠা-১৬১

৮৯) তদেব, পরিশিষ্ট- খ, পৃষ্ঠা-১০